অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান গৌরসুন্দরের বহ্নিগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার

ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল শ্রী ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের
বহ্নিগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ নবদ্বীপ নদীয়া

অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের
বহ্নিগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার

প্রবক্তা

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-
সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রীচৈতন্য-সারস্বত
কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও সভাপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী
শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের
কৃপানির্দ্দেশে

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ নবদ্বীপ নদীয়া

হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

অনুবাদক ঃ
ডঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী, এম্ এ, পি. এইচ. ডি., (উৎকল), এম্. এ. (সংস্কৃত); এম্. এ. (সাংবাদিকতা, কলিকাতা), কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সাংখ্য-বেদান্ত-সাহিত্য শাস্ত্রী (ঢাকা), অবসরপ্রাপ্ত ও, ই, এস, অধ্যক্ষ, ডাইরেক্টর, জগন্নাথ রিসার্চ সেন্টার, উড়িষ্যা।

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব তিথি
৩১জানুয়ারী, ২০০৭

টাইপ সেটিং ঃ
প্রিন্ট এণ্ড পাবলিসিটি
১১৭ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রণঃ
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১/এ বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিতং
পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দগ্ধ-দুঃখ-খণ্ডিতম্।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্।।

দেবগণ, সিদ্ধ, মুক্ত, যোগিগণ ও ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা যাঁহার স্তব করিতেছেন, (সদোপাস্য ... পরমেষ্ঠি-প্রভৃতিভিঃ) ও যিনি (ঈশ-বৈমুখ্যরূপ) অপকর্ম্ম জাত (ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামনা-জনিত) ত্রিতাপ দাবানলে দগ্ধ বিশ্বের দাহজ্বালা খণ্ডনকারী, শ্রীকৃষ্ণনামরূপ সুধা-ভাণ্ডারের স্বনাম-ধন্য দানসাগরস্বরূপ (সুধাকরের জন্ম ক্ষীর সাগর)—সেই দেবতা প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরেরই আমি স্তব করি।

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-গাম্ভিরান্ত্য-লীলনং
দ্বাদশাব্দ-বহ্নিগর্ভ-বিপ্রলম্ভ-শীলনম্।
রাধিকাধিরূঢ়-ভাব-কান্তি-কৃষ্ণ-কুঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্।।

অতি অন্তরঙ্গসঙ্গী শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দের সঙ্গে যাঁহার সেই জনমর্ম্মভেদী গম্ভীরালীলার প্রকাশ পরাকাষ্ঠা ও সেই সুদীর্ঘ দ্বাদশ-বর্ষ-ব্যাপী নিদারুণ শ্রীকৃষ্ণ-বিরহাগ্নি-উদ্গীরণময় যাঁহার দিব্যোন্মাদ সংলাপ (বাহিরে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়) এবং যিনি শ্রীরাধার প্রগাঢ় ভাবে সর্ব্বাত্ম প্রভাবিত ও শ্রীরাধিকার শ্রীঅঙ্গজ্যোতিঃ সুশোভিত সেই মদমত্ত গজরাজ সদৃশ স্বয়ং গোবিন্দ—সেই দেবতা প্রেমময়মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরেরই আমি স্তব করি।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
(শ্রীশ্রীপ্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম্)

ওঁ বিষ্ণুপাদ বিশ্ববরেণ্য

শ্রীল শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য

শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

তুলসী মহারাণী

শ্রীনবদ্বীপ শ্রীচৈতন্যসারস্বত মঠের সেবিত

শ্রীশ্রীগুরু - গৌরাঙ্গ - গান্ধর্ব্বা - গোবিন্দসুন্দরজীউ

নম্র নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরু, বৈষ্ণব, ভগবানের শ্রীচরণ বন্দনা করে কিছু নিবেদনের প্রয়াস করছি। শ্রীচৈতন্য লীলা বিস্তারকারী জগদগুরু প্রভুদ্বয় শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী যে ভাবে অপ্রাকৃত গৌরকথা জগতকে দান করেছেন তা লাভ করে গৌরভক্ত গণের আজ আর আনন্দের সীমা নাই। তেমনি আমাদের পরমসৌভাগ্য যে সেই চৈতন্যলীলা অক্ষয় সরোবরে বিচরণকারী পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস-কুলবরেণ্য শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ প্রাণভরে গৌরলীলামৃত বিশ্বোদ্যানে বিতরণ করেছেন। তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচিত সুধী গৌরভক্ত গণের অতিপ্রিয় 'প্রেম-ধাম-দেব-স্তোত্রম' নামে প্রকাশিত গৌর-লীলা-সুধা বর্ণনে। সেখানেই শেষ নয় পরবর্তী কালে ভ্রমরের মত ছুটে আসা গৌরভক্তগণের কাছে উজাড় করে বর্ণন করেছেন গৌরকথা যেটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, 'গোল্ডেন ভল্‌কানো অফ্ ডিভাইন লাভ' নামে। যার মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পেয়েছে অভিনব হেমাভ ভগবান গৌরসুন্দরের বহিঃর্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলাকথা। এরই বাংলা অনুবাদ রূপে ইতিপূর্বে 'শ্রীশিক্ষাষ্টক' ও বর্তমানে এই 'অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান গৌরসুন্দরের বহিঃর্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার' নামে প্রকাশিত হয়েছেন।

পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখনিঃসৃত এই গৌর লীলা কথা ইংরাজী ভাষায় পাঠ করে এমন অপূর্ব মধুর গৌর কথার পরিবেশন লক্ষ্য করে বাংলা ভাষায় প্রকাশের অত্যন্ত লোভ হওয়াতে মাদৃশ অধমের শ্রীগুরু, গৌর ও তদ্ভক্তগণের কৃপা লাভ বাসনায় এটি প্রকাশের এই অনভিজ্ঞ প্রয়াস।

গ্রন্থের বিষয় বস্তুর পরিচয় আমার মত ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হলেও পরমারাধ্য পরমহংস-কুলবরেণ্য শ্রীলগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেবগোস্বামী মহারাজের অসীম কৃপাধন্য বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্ত্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ এটির বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ করে প্রচুর আনন্দ লাভ করেছেন ও এর সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান গৌরসুন্দরের বহিঃর্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার'। সুতরাং এর থেকেই গ্রন্থের বিষয়ে কিছু ধারণা আমাদের হতে পারে, তবে গ্রন্থের ভেতর প্রবেশ করলে গৌরলীলার যে চমৎকার মাধুর্য্য আস্বাদন হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

অভিনব পুরটসুন্দর ভগবান গৌরসুন্দরের বহিঃর্গর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলা প্রসঙ্গে প্রবক্তা শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ বলছেন, **"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দিব্য প্রেম লক্ষণ সমূহ সারা পৃথিবীর ইতিহাস বা কোন শাস্ত্র সমূহে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর চরিত্রে আমরা পরাৎপর ঈশ-তত্ত্বের সর্ব্বোত্তম**

প্রকাশ বা স্বরূপ লক্ষ্য করি। সেই পরম সুন্দর সুবর্ণবরণ ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি ইঙ্গিত, প্রতিটি বিচরণ ভঙ্গিমা আপন লীলা মাধুর্য্যে রচনা করেছেন তাঁরই আনন্দ রসঘন লীলা বিলাস। ....শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে বিরহই হলো অপ্রকৃত জগতের সর্ব্বোচ্চতম আদর্শ।....শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসার অর্থই হোলো প্রকৃত দিব্য জীবন লাভের জন্য সেই শ্রীকৃষ্ণ তৃপ্তর্থে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করা। প্রাথমিক অবস্থায় এই অপ্রাকৃত প্রেম আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার ন্যায় বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহোল সঞ্জীবনী সুধা, অমৃতময় জীবন।"

গৌরকথার অমৃতধারা আনয়নকারী শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে গৌরকথা জগৎকে দান করেছেন তার যেমন তুলনা নেই; সেরকম মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের গৌরকথা বর্ণনভঙ্গীর গভীরতা, চমৎকারীতা, সারকথার বিস্তৃত ব্যাখ্যার তুলনা কোথায়? ইতিপূর্বে গৌরকথা শ্রবণকারী, পাঠকারী, সুধীভক্তগণ তা ব্যক্ত করেছেন।

শেষে পরমগৌরভক্ত শ্রীলবাসুঘোষ ঠাকুরের বিখ্যাত পদটি মনে হচ্ছে—

যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে
রাধার মহিমা প্রেমরস সীমা
জগতে জানাত কে?

তেমনি যদি শ্রীলকৃষ্ণ দাস কবিরাজ বা তদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী জগতে না আসতেন তা হলে এই অভিনব বহিঃগর্ভ বিপ্রলম্ভ ভগবান গৌরসুন্দরের লীলামৃত মাধুরী ব্যাখ্যা করে জগতকে কে জানাত?

এই গ্রন্থটি ইংরাজী থেকে বাংলায় পরমোৎসাহে অনুবাদ করেছেন আমাদের পরমশুভাকাঙ্খী সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ শ্রীদোলগোবিন্দ শাস্ত্রিজী। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় শাস্ত্রিজী অনুবাদ করতে করতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দিব্যলীলা কথার চমৎকার পরিবেশন আস্বাদন করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ব্যক্ত করেছেন, এই গ্রন্থটি হোলো 'অভিনব চৈতন্যাবতারের অনর্পিত চরিতসুধা'। তাঁর এই অনুবাদ সেবা সহায়তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই।

গ্রন্থটি প্রকাশে ভুলত্রুটীর জন্য অদোষদরশী বৈষ্ণব গণের কাছে ও শ্রদ্ধালু ভক্তগণের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। ইতি—

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব তিথি
৩১।১।২০০৭

কনকাবতার

করভাজনঋষির শিক্ষায় আমরা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন যুগাবতারের উল্লেখ দেখতে পাই। দ্বাপর যুগের যুগাবতারের উল্লেখ এই ভাবেই হয়েছে:

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যাম: পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ।।

দ্বাপরযুগে কৃষ্ণ মেঘশ্যামলবর্ণ বিদ্যুৎ অর্থাৎ পীতবর্ণ বস্ত্রধারণ করে অবতীর্ণ হন। তিনি অত্যন্ত সুন্দর অলঙ্কার সমূহে সুসজ্জিত তাঁর বক্ষস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন অঙ্কিত এবং তিনি তাঁর নিজ অস্ত্র ধারণ করে থাকেন।

দ্বাপরযুগের যুগাবতার বর্ণন করার পর করভাজন ঋষি কলিযুগের অবতারের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন:

ইতি দ্বাপর উর্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু।।

তিনি বলেন, ‘‘রাজন্! দ্বাপরযুগপর্যন্ত আমি বিভিন্ন যুগের অবতারগণের বর্ণনা শেষ করেছি যাঁরা জগতে বিভিন্ন যুগোপযোগী ধর্ম বা বর্ণাশ্রমের ধর্ম পুনঃ প্রচার করে থাকেন। ‘‘তাঁরা এসে বলে থাকেন তোমরা যদি এই উপদেশ অনুসারে আচরণ কর, তবে তোমরা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপকার পাবে। হে রাজন! দ্বাপর যুগ শেষ হওয়ার পর কলিযুগ আরম্ভ হয়।

কলিযুগাবতারের কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে অনেক স্থলে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আমি সে সমস্ত তোমাদের কাছে বর্ণনা করছি, তারপরে তিনি বলেন:

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।

এই শ্লোকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা খুব সাংকেতিক ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কালো রং, কিন্তু ‘ত্বিষাঽকৃষ্ণ’— অর্থাৎ তাঁর বা সেই অবতারের দেহের রং বা কান্তি হল ‘অকৃষ্ণ’ বা কালো নয়, তিনি আবার নিজের পার্ষদগণের সহিত বা সপার্ষদ। তিনি সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত বা উপাসিত, সেটি পবিত্র কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন এবং যাঁরা সুধী, অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞানীগণ ভগবানের এই প্রকার উপাসনাই করে থাকেন।

কনকাবতারের কনকাবদান

শ্রীজীব গোস্বামী উক্ত শ্লোকের স্বকীয় অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন:

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ।।

অর্থাৎ আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আশ্রিত হয়েছি, যিনি বাইরে আকারে গৌরবর্ণ, কিন্তু অন্তরেতে তিনি স্বয়ং কৃষ্ণই। তিনি এই কলিযুগে যখন পরম পাবন শ্রীকষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করেন, তখন তাঁর পার্ষদগণই তাঁর প্রকাশ বা বিলাস-বিগ্রহরূপে পরিবেষ্টিত হয়ে শোভিত হন। "অন্তঃ কৃষ্ণম্"-এর অর্থ হচ্ছে তিনি অন্তরে বাস্তবতঃ স্বয়ং কৃষ্ণই; আর "বহির্গৌরম্" এর অর্থ— তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়েছেন। কলিযুগে এই গৌরহরি স্ব-পার্ষদ অঙ্গ-উপাঙ্গাদি ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তন করছেন।

কেহ কেহ তর্ক করতে পারেন যে, তাঁর বর্ণ বা রং কৃষ্ণ এবং 'কৃষ্ণবর্ণং" এই শব্দদ্বয়ের কৃষ্ণ অর্থে 'কালো'; 'বর্ণ' অর্থে গায়ের রং অর্থাৎ তিনি দেখতে কালো। কিন্তু "ত্বিষা অকৃষ্ণং" এখানে 'ত্বিষা' গায়ের রং বা কান্তি, দীপ্তি ইত্যাদি অর্থ দ্বিরুক্তিবাচক হয়ে যায়। কারণ প্রথম 'বর্ণ' শব্দটির অর্থ বাচক দু'টি শব্দ ব্যবহার করলে দ্বিরুক্তি দোষ এসে যায়। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ইত্যাদি দোষ থাকে না। সুতরাং প্রথম 'বর্ণ' শব্দ গায়ের রং হতে পারে না। তাই তাঁর শ্রীঅঙ্গের রং কৃষ্ণ নয়, তা অকৃষ্ণ অর্থাৎ ন কৃষ্ণ। অতএব প্রথম বর্ণ অর্থে অক্ষর (alphabet)। বর্ণ এই শব্দের দু'টি অর্থ — রং ও অক্ষর। পরবর্ত্তী ত্বিষা অকৃষ্ণ, ত্বিষা— শরীরের রং, প্রভা বা কান্তি। অ (ন) কৃষ্ণ — কালো নয়। প্রথম কৃষ্ণবর্ণ অর্থ এই দুটি অক্ষর—অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ — এই অক্ষর দুটি বর্ণনা করেন কীর্ত্তন বা উচ্চারণ করেন।

এখন অকৃষ্ণ অর্থাৎ কালো রং নয় — এই অর্থে যে স্বর্ণ-গৌর বর্ণ হবে, তার প্রমাণ কি?

গৌরবর্ণ-দুই প্রকার—চম্পক বা হেম গৌর অর্থাৎ পীতবর্ণ এবং তুষার বা দুগ্ধ বা কর্পূর-গৌর। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রং মহাদেব বা, বলরামের মত তুষার ধবল নয়, তা কনকগৌর, চম্পক গৌর বা কেতকীগৌর—পীতবর্ণ যা শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীঅঙ্গের রং—কান্তি।

অকৃষ্ণ অর্থে লাল, নীল ইত্যাদি অর্থ গ্রহণ না করে কেবল পীত বা স্বর্ণ গৌর অর্থ করার প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতেই দেওয়া হয়েছে।

এক সময় বসুদেব গোপনে কৃষ্ণের নাম-করণ-সংস্কার করার জন্য গর্গমুনিকে নন্দ মহারাজের নিকট বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দিলেন। গর্গমুনি নন্দ মহারাজের কাছে এসে বললেন যে, বসুদেব রামকৃষ্ণের নামকরণের জন্য তাঁকে পাঠিয়েছেন। কারণ তাঁর পুত্রগণের এখন নামকরণ করার বয়স হয়েছে। তিনি কৃষ্ণের সম্পর্কে বললেন:

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।

ভাঃ ১০/৮/১৩

অর্থাৎ তোমার এই ছেলে বিগত অবতারগুলিতে যুগোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেগুলি হল শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ। এখন অর্থাৎ এই অবতারে সে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছে।

তিনি আরও বললেন, কৃষ্ণ সত্যযুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, এখন এই দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। চারি যুগের বাকী রইল কলিযুগ; আর বর্ণ রইল পীতবর্ণ, এতে সহজেই বুঝাযায়, তোমার ছেলে এই কৃষ্ণ আগামী কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হবেন।

আবার এই স্বর্ণ বা পীত বর্ণের উল্লেখ উপনিষদেও দেখতে পাওয়া যায়।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্ (মুন্ডক ৩। ১। ৩)

হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজ ব্রহ্ম নিষ্কলম্ (মুন্ডক ২।১।২।৯)

ধ্যেয়ং সদা ....হিরন্ময়বপুধৃতঃ

হিরন্ময়পুরুষঃ ....সর্বএব সুবর্ণঃ— ইত্যাদি

(ছান্দোগ্য ৪র্থ অধ্যায় ৬-৭ অনুছেদ.)

সুতরাং "আসন্ বর্ণা" শ্লোকে 'পীত' অর্থ স্বর্ণবর্ণ।

কৃষ্ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন; আরও তিনি বৃন্দাবনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমি গোপীগণের বিশেষত রাধারাণীর মহিমা কীর্ত্তন করব। তাঁর নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করতে করতে এই পৃথিবীর ধূলাতে গড়াগড়ি দেব কিন্তু রাধারাণী বললেন, "আমি তোমার শ্রীঅঙ্গে সেই ধূলো স্পর্শ করা সহ্য করতে পারব না, তার চেয়ে আমিই তোমার শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তোমার সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখব"।

তাই যখন কৃষ্ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হন, তখন শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি তাঁর শ্রীঅঙ্গ আবরণ করে রাখে। কিন্তু তা সব কলিযুগে ঘটে না, কেবল কোন বিশেষ কলিযুগেই হয়ে থাকে।

ব্রহ্মার প্রত্যেক দিবসে, প্রত্যেক কলিযুগে কৃষ্ণের যুগাবতার অবতীর্ণ হন। কিন্তু কৃষ্ণ কেবল একটি ব্রহ্ম দিবসে অবতীর্ণ হন এবং তা ঘটে কেবল প্রত্যেক ৪.৩ কোটি বর্ষপূর্তি কলিযুগেই। সেই সময় স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই **(Original Absolute Supreme Personality of God-head)** তাঁর ধাম বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ সহ অবতীর্ণ হন। তবে কৃষ্ণ ও মহাপ্রভু একাকী আসেন না, তার সঙ্গে তাঁর যাবতীয় লীলা-পরিকর ও অঙ্গ-উপাঙ্গ— সকলেই অবতীর্ণ হন।

মাধুর্য্যবিগ্রহ নিজেই স্বমাধুর্য্যের আস্বাদক

কলিযুগে তিনি (কৃষ্ণ) দুইটি লীলারস আস্বাদন করেন। তিনি নামসংকীর্ত্তনরসামৃত বিতরণ করেন; তদুপরি নিজের রসমাধুর্য্য আস্বাদন করার জন্য শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও কান্তি ধারণ করেন। তিনি নিজেই ঘনীভূত রসবিগ্রহ, তাই ভেবে চলেন আমার রসসিন্ধুর গভীরতা কত? আমারই রস; আমিও তার অতল গভীরতা জানতে পারব না! কিন্তু তা কি হয়? কেবল কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত আর কি কেউ পারে— কৃষ্ণও না। সেই কৃষ্ণভক্তের চরম সীমা কেবল রাধারাণীই। কৃষ্ণ নিজেই রসমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা ও কেন্দ্রবিন্দু, আর একমাত্র আরাধ্যা সেই ঘনীভূত রসাস্বাদক সম্প্রদায়ের চরম অধিরূঢ় মহাভাব স্বরূপিণী রাধারাণী তাই কৃষ্ণ সেই রাধারাণীর স্বভাব, মহাভাব, কান্তি ও চিত্তবৃত্তি সবই নিতে পারলে তবেই তিনি স্বমাধুর্য্য রসানন্দের আস্বাদ পেতে পারবেন। এই কারণেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে রাধা-ভাব-কান্তি নিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

কৃষ্ণের প্রথম উদ্দেশ্য যদিও নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন, মুখ্য এবং আন্তর স্বকীয় অভিলাষ হল স্বভজন-বিভজন অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে রামানন্দরায়, স্বরূপ দামোদর এবং অন্যান্য অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের সঙ্গে শেষ বার বৎসর তিনি কৃষ্ণবিরহ বেদনার তীব্রতার অন্তরালে মিলনানন্দ সুধাসিন্ধুর অনন্ত প্রেমরসাস্বাদনে নিমগ্ন ছিলেন। সেই বিচ্ছেদে মিলনানন্দরসসুধা পানোন্মত্ততা এক নিমেষের জন্যও বিরতি ছিল না।

কৃষ্ণের এই অভিনব অবতরণের আরাধনা কেবল সংকীর্ত্তনের দ্বারাই হয়ে

থাকে। সংকীর্ত্তন ব্যতীত সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা আর কোন সাধনের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ তিনিই সংকীর্ত্তন মার্গের মুখ্য প্রবর্ত্তক এবং সংকীর্ত্তন প্রেমোল্লাসী, কেবল সংকীর্ত্তনের দ্বারাই তিনি উপাসিত হন, সংকীর্ত্তন যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত ও সংতৃপ্ত হয়ে থাকেন। কেবল সুবুদ্ধি-সাধকগণই এই সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁকে আরাধনা করে থাকেন। সাধারণ মানব সেই যজ্ঞে যোগদান করার সৌভাগ্য পেতে পারেন না। সুকৃতি-সম্পন্ন সুমেধাগণই সাধুসঙ্গের দ্বারা সেই পরম সত্যের রহস্য ভেদ করে নাম সংকীর্ত্তন সুধা পান করার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।

প্রেমই পরমপ্রাপ্তি (Love is Supreme)

যার মস্তিষ্ক আবর্জনায় ভরা, সে এই সাধারণ ব্যাপারে কোন্‌টা ভাল কোনটা মন্দ, তা বুঝতে পারে না। আর প্রেম যে কত মহান তা সে কি করে বুঝবে! এত উচ্চস্তরের চিন্তাধারার ভাবকে অনুসরণ করা ত' দূরের কথা আদর্শনিষ্ঠা উন্নত অভিরুচি ও মহত্তর অভীপ্সা দেখেই মানুষের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। আদর্শ মহৎ হলেই মানুষ মহান্‌পদবাচ্য হয়। তবে সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওয়া উচিত, তাই বিচার্য্য। ব্যবহারিক বা পারমার্থিক বিচারে প্রেমই সর্বোত্তম আদর্শ। প্রেমই মহান ও দুর্লভ বস্তু। এই সংসারে যত কিছু বস্তু আছে, তার মধ্যে ভগবৎপ্রেম ও অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যই সর্বোত্তম বস্তু। যাঁরা এই কথাটি বুঝতে পারেন তাঁরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান্ (সুমেধস)। যার হৃদয়ে এই সর্বোত্তম আদর্শ পরিনিষ্ঠিত হয়ে যায়, সেই সর্বোচ্চ স্তরের ব্যক্তি হিসাবে গণ্য। একমাত্র সেই সংকীর্ত্তনের যথার্থ মর্ম অনুভব করতে পারে, নিজে আচার-প্রচার করতে পারেন, সেই প্রকার ব্যক্তিই নাম সংকীর্ত্তনের অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতির সর্বোত্তম পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

প্রচ্ছন্নাবতার

ছন্নাবতারের উল্লেখ শ্রীমদভাগবত, মহাভারত এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে পাওয়া যায়। নবযোগীন্দ্রের শেষ করভাজন ঋষিই আমাদের সূত্রাকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এই কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই কৃষ্ণের বিশেষ অবতার। তিনি কলিযুগাবতারের পরিচয় একটি রহস্য ঘন ভাষায় প্রকাশ করে দিয়েছেন। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সোজা কথায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হল না কেন? আরও অনেক অবতারের কথা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে! অথচ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে কলিযুগাবতার রূপে বর্ণনা করতে গিয়ে এমন হেঁয়ালি ভাষা ব্যবহার করার দরকারটা কিই বা ছিল?

এর সঠিক উত্তর শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের ভাষায়ই পাওয়া যায়, তিনি যখন বলেন— হে প্রভো আপনার অনেক নামের মধ্যে একটি নাম "ত্রিযুগ"—

ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং

চ্ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।ভাঃ ৯। ৯। ৩৮

"ত্রিযুগ" শব্দের অর্থ সত্য ত্রেতা, দ্বাপর কিন্তু কলি নয় কেন? কারণ, কলিযুগাবতার প্রচ্ছন্নই— 'ছন্নঃ কলৌ যদ ভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।'

এই খানেই আমরা আসল সূত্রটি পেয়ে যাই যাতে বুঝাযায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই সেই চ্ছন্নাবতার এবং তা কেবল সুকৃতিবান্ সুমেধাগণই ধরতে পারেন, সাধারণ ব্যক্তির তা বোধগম্য হওয়ার নয়।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং

তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

হে মহাপ্রভো! তোমার শ্রীচরণারবিন্দই সর্বদা একমাত্র ধ্যেয় বা ধ্যানযোগ্য। কারণ সেই পদকমল কেবল সংসার প্রশমন করে না, অধিকন্তু যাঁরা সেই শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, তাঁদের সর্বোত্তম সিদ্ধি প্রাপ্তি হয়ে থাকে।

তাঁর সেই শ্রীপদারবিন্দই সর্বতীর্থকেই পবিত্রতীর্থ করে থাকে, সর্ব সাধুচিত্তকেও পবিত্র করে থাকে। দেবদেব মহেশ্বর ও আদিদেব ব্রহ্মাও সেই রাতুল চরণ ছায়ায় আশ্রয় কামনা করে থাকেন। হে মহাপ্রভো! যে তোমাকে "আমি তোমার শরণাগত"— কেবল এই টুকুই কায়মনোবাক্যে বলে থাকে, তাকে তুমি সর্বথা আশ্রয় দিয়ে থাক। তুমি শরণাগতের সর্ব দুঃখ-দুর্দ্দশাই হরণ করে থাক। তোমার শ্রীচরণ কমল স্বরূপ নৌকাকে আশ্রয় করে আমরা এই বিশাল সাংসারিক দুঃখসাগরকে অক্লেশেই অতিক্রম করে থাকি। হে প্রভো! আমি তোমার শ্রীচরণে পুনঃ প্রণাম করি।

শ্রীমদ্ভাগবত কলিযুগাবতারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার ঠিক পরে পরেই উক্ত উদ্ধৃতি শ্লোকটিতে ঐ যুগাবতারের স্তুতি করেছেন, আর সেই যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই।

শ্রীমদ্ভাগবতই উদাত্ত কণ্ঠে কলিযুগেরই যুগাবতারের প্রশংসা কীর্ত্তন করেছেন। যে শ্লোকে চ্ছন্নাবতারেরই সূচনা দেওয়া হয়েছে, ঠিক তার পরেই এই "ধ্যেয়ং

সদা" শ্লোকটি বলা হয়েছে। কৃষ্ণবর্ণং এর অর্থ হচ্ছে যিনি সর্বদা কৃষ্ণকে বর্ণনা করেন, সর্বদা "কৃষ্ণ কৃষ্ণ"— এই দুইটি বর্ণ (Words) উচ্চারণ করেন।

আর একটি অর্থ হচ্ছে, "যিনি স্বয়ংই কৃষ্ণ, কিন্তু যাঁর বর্ণ— শ্রীঅঙ্গের কান্তি (lustre or colour) কৃষ্ণ নয়। আমরা যদি খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করি, তবে বুঝতে অসুবিধা হবে না, যে, ঐ 'সোনারবরণ' এর মাঝে 'কৃষ্ণ' — 'কালা-কৃষ্ণই' লুকিয়ে আছে। কেবল তিনি একাই নন তাঁর পার্ষদ-অঙ্গ-উপাঙ্গসহ তিনি নেমে এসেছেন এই ভূলোকে; এবং তাঁর সেবা করা যায় কেবল সংকীর্ত্তন বা অনেক মিলে একত্র ঐ শব্দ ব্রহ্মের কীর্ত্তন দ্বারা। এই লক্ষণ দ্বারাই আমরা তাঁর অপ্রাকৃত স্বরূপের পরিচয় পেতে পারি।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাস্তবিক্ক এক গোপন-অবতার। তিনি ছদ্মবেশেই আসেন। এই প্রকার অবতারের উপাসনা কেবল সুমেধাগণই করে থাকেন। ভক্তিবিজ্ঞানীগণই করে থাকেন।

এই প্রকারেই শ্রীমদ্‌ভাগবত অসামান্য অত্যদ্ভুত ভগবদ্‌ বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে রহস্যাচ্ছন্ন ভাষায় বর্ণনা করেন এবং পরে পরেই আবার তাঁর মহান্‌ ভগবৎসত্তাকে পরিপ্রকাশ করেন।

তারপরে শ্রীমদভাগবত বলেন, সেই ভগবৎ স্বরূপ যিনি রামচন্দ্র ও কৃষ্ণরূপে অবতরণ করেন, তিনিই আবার এসেছেন। এখন তিনি প্রত্যেক জীবের বাস্তবসিদ্ধির পথ নির্দেশ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি গোলোক বৃন্দাবনের প্রেমরসামৃতবারি ধারা বর্ষণ করে চলেছেন। কেবল তাঁকেই ধ্যান কর, তাতেই সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। তিনি সর্বতীর্থ পবিত্র করার দেবদূত হয়ে এসেছেন। কেবল তাঁর পবিত্র স্পর্শের দ্বারা কৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলা-সংকীর্ত্তনের দ্বারা, গোলোকের সর্বোত্তম প্রেমামৃতধারাকে ভূলোকে নামিয়ে আনবে, আর ব্রহ্মা-শিবাদি তাঁর এই অনর্পিত ঔদার্য্য দর্শনে স্তব্ধীভূত হয়ে তাঁর স্তুতি করবেন। কেবল স্তুতিমাত্র নয় তাঁরা সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণাশ্রয়ে নিজের জীবন সার্থক করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়বেন। তাঁর শ্রীচরণাশ্রয়ে সকলের সকল দুঃখ দূর হয়ে যাবে, অন্তরের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনও মিটে যাবে। যাঁরা তাঁর আশ্রিত হবে, তাঁদের সব দায়িত্বই তিনি গ্রহণ করবেন, তিনি সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন।

এই সংসারে বদ্ধজীবের কতপ্রকার দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করতে হয়, জন্ম মরণের কত প্রকার যাতনা সহ্য করতে হয় তা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু তিনি এমন একটি উদ্ধারকারী জাহাজ, যার আশ্রয়ে এই সংসার সাগরের যাবতীয় যাতনা দূরে সরে যায়।

তাই এস, আমরা সকলে সেই মহাপুরুষের শ্রীচরণ কমলতরীকে একান্তভাবে আশ্রয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই। তিনি এমন একটি কাণ্ডারী যে, তাঁর সেই সর্বোত্তম প্রেমসেবারস আস্বাদন করে ধন্য হই। তাই শ্রীমদ্ভাগবত পুনশ্চ উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন—

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ্য সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

হে মহপ্রভো! আপনি সৌভাগ্যলক্ষ্মী ও তাঁর ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করেছেন, যা কি ত্যাগ করা অতীব দুষ্কর এবং দেবতাগণও কামনা করে থাকেন। আপনি নিষ্কলঙ্ক আদর্শ ধর্ম স্থাপনার জন্য ব্রাহ্মণের অভিশাপকে উপলক্ষ্য করে বনবাস স্বীকার করেছেন। যে সকল পাপক্লিষ্ট মানব মায়ামুগ্ধ হয়ে অলীক সুখভোগের জন্য ধাবিত তাদের উদ্ধার করার জন্য আপনি তাদের অনুসন্ধান করে তাদিগকে নিজের সেবাসুখ দান করেন, আবার নিজেও পরম মাধুর্য্যবিগ্রহ কৃষ্ণকেও অনুসন্ধান করেন।

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকা সম্পর্কে লিখেছেন, যদিও আপাতদৃষ্টিতে এই শ্লোক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারলীলা অর্থাৎ পিতৃসত্য রক্ষা করার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাস, মায়ামৃগ অনুধাবন ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে, এই লীলার অন্য একটি গূঢ়অর্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংসার ত্যাগ ইত্যাদিরও সূচনা দেওয়া হয়েছে। তাই শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকে কিভাবে শ্রীচৈতন্য লীলা অন্তর্নিহিত আছে, তাও ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

"ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্য লক্ষ্মীং" -এর অর্থ তিনি সাম্রাজ্য সম্পদ ত্যাগ করলেন। যে সম্পদ ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন। সাধারণত এই বাপারটি রামচন্দ্রের লীলায় ঘটেছিল। কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন যে, সুরেপ্সিত রাজ্য লক্ষ্মীর অর্থ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর অপ্রাকৃত সঙ্গ। জাগতিক দৃষ্টিতে ওটী খুব একটা বড় কিছু ব্যাপার না হতে পারে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর যে ত্যাগ বা শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রতি যে অসাধারণ ত্যাগপূত আত্মনিবেদন তা যে কোন সাম্রাজ্য সম্পদ থেকে অনেক উচ্চ স্তরের কথা এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাকেও ত্যাগ করতে পেরেছিলেন। এমন ত্যাগপূত প্রেমসেবা বৈকুণ্ঠলোকেও দুর্লভ, মর্ত্ত্য লোকে ত' দূরের কথা। জগতের মঙ্গলের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর এত ত্যাগ, এত প্রেম, এত স্নিগ্ধসেবা— সব তুচ্ছ করে ত্যাগ করে চলে গেলেন — সন্ন্যাস নিলেন।

ব্রাহ্মণের অভিশাপ

"ধর্মিষ্ঠ-আর্য্য-বচসা যদগাদরণ্যম্" শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা অর্থাৎ গৃহস্থলীলা পরিত্যাগের কারণ স্বরূপ একজন কেবল মাত্র দুগ্ধপায়ী ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু গভীর রাত্রে ঘরের মধ্যে কপাট বন্ধ করে নিজের একান্ত ভক্তগণের সঙ্গে কৃষ্ণলীলা সংকীর্ত্তন করতেন। ঐ ধার্মিক ব্রাহ্মণ একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বললেন, আমি তোমার কৃষ্ণলীলা সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে চাই। আমি কেবল মাত্র দুগ্ধপান করি, আর কিছুই খাই না। আমি কেন যোগদিতে পারব না।"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বললেন, "কৃষ্ণলীলা অনুশীলন করার যোগ্যতা কেবল মাত্র দুগ্ধপান নয়।"

তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ দিব— "তোমার সংসার নাশ হউক।"

মহাপ্রভু তার সেই অভিশাপ স্বীকার করে নিলেন। তার কিছু দিন পরে মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন এবং যাঁরা মায়ামোহিত হয়ে কেবল অলীক ক্ষণস্থায়ী সংসার সুখভোগের জন্য দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে, তাঁদের উদ্ধার করার জন্য তাঁদের পেছনে ছুটে চললেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজের যে মনোহভীষ্ট কৃষ্ণ হয়েও শ্রীরাধারাণীর ভাবাবিষ্ট হয়ে কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন— সেই মনোহভীষ্ট চরিতার্থ করলেন। ইহাই তিনি জগৎকে শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এইভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অব্যক্ত লীলা ব্যক্ত করেছেন— একটি রহস্য ঘন গূঢ় ভাষার মাধ্যমে।

রহস্যময় অবতার

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীজগন্নাথ নীলাচল ক্ষেত্র পুরীতে চলে গেলেন। যাওয়ার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সমগ্র ভারতের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অদ্বৈতবেদান্তাচার্য্য, ক্ষেত্র সন্ন্যাসী, দশনামী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীগণেরও বন্দনীয় পণ্ডিত চূড়ামণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্যকেও নিজের একান্ত বশীভূত শিষ্যরূপে গ্রহণ করেনিলেন। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য স্ব-সম্প্রদায় ত্যাগ করে একান্ত ভাবে ভক্তিযোগপন্থার আশ্রিত হয়ে গেলেন। নবদ্বীপবাসী গোপীনাথ আচার্য্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের শ্যালক এবং তিনি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে আসার পর সার্বভৌম গোপীনাথের কাছ থেকে মহাপ্রভুর পূর্ব পরিচয় জেনে নিলেন। কারণ গোপীনাথ মহাপ্রভুর আসার বহু পূর্ব থেকে শ্রীক্ষেত্রে এসে বাস করছিলেন।

সার্বভৌম গোপীনাথকে বললেন, এই যুবক সন্ন্যাসীর প্রতি আমি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি। কিন্তু এত কম বয়সে সন্ন্যাস নেওয়া তার উচিত হয় নাই। সন্ন্যাসীর কঠোর ত্যাগীর জীবন! একি এর মর্য্যাদা বজায় রাখতে পারবে! তাই নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারিনা। যাই হোক না কেন পূর্বের গ্রাম সম্পর্কে এখানে আমিই ত' তার অভিভাবক। আর একটি কথা--- এই ছেলেটিকে আমার বেশ ভাল লাগছে। অভিভাবক হিসাবে তার জন্য কিছু করা ত আমার কর্ত্তব্য। শুধু কর্ত্তব্য নয় আমার এটা গুরু-দায়িত্বও বটে। তাই ভাবছি আমিই তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করব যাতে সে জাগতিক ভোগাসক্ত হয়ে সন্ন্যাস ত্যাগ না করে, সন্ন্যাসীর মর্য্যাদায় আঁচড় না আনে। গোপীনাথ চুপ করে এ যাবৎ শুনছিলেন। কিন্তু ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে, আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। সার্বভৌম তার নিজের ভগ্নীপতি, বয়সে অনেক বড়, ভারতবিখ্যাত বৈদান্তিক পণ্ডিত হতে পারেন; কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতি এই মুরব্বীপানা তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। বলতে আরম্ভ করলেন—

"তুমি এসব কি আবোল তাবোল বলতে আরম্ভ করেছ--- ছেলেটি খুব সুন্দর, আকর্ষণীয়, বিদ্বান। তোমার ভাল লেগেছে, তুমি তাঁর অভিভাবক, সন্ন্যাস জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাও? তুমি তাঁর এত বড় হিতৈষী! এসব কি বলছ তুমি? তুমি জান? তিনি কে? — তিনিই এই কলিযুগে ভগবানের অবতার, নিগুঢ় অবতার, প্রচ্ছন্নাবতার। কলিযুগের সর্বোত্তম এবং সর্বজীবের গ্রহণযোগ্য সাধনযোগ্য

নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম প্রচার করতে নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটা আমার মুখের কথা নয় শাস্ত্র বাক্য। শ্রুতি, স্মৃতি, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি পুরাণে তার বহু প্রমাণ বাক্য রয়েছে।"

সার্বভৌম একটু যেন বিরক্তির স্বরে বললেন,— "না.... না... তুমি একটা আজেবাজে লোকের সঙ্গে কথা বলছ না; তুমি কি মনে করেছ তুমি যা ইচ্ছে বলে যাবে, আর আমি মেনে নেব! তেমন মানুষ আমি নই। কি বল্‌লে তুমি? কলিযুগে কোন অবতারই নাই। মহাভারতের বিষ্ণুসহস্রনামে বিষ্ণুর একটি নাম "ত্রিযুগ" বলা হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে যে ভগবান কেবল তিনটি যুগেই অবতরণ করেন, কলিযুগে কল্কী অবতার ব্যতীত অন্য কোন অবতার নাই। আর এই কল্কী হচ্ছেন লীলা অবতার, যুগাবতার নন।" গোপীনাথ উত্তর দিলেন—

"তুমি ত' নিজেকে খুব বিদ্বান ও সব শাস্ত্রই পড়ে ফেলেছ বলে মনে কর; জ্ঞানের অহঙ্কার ত' তোমার কম নয়। মহাভারত ও শ্রীমদ্‌ভাগবতই হচ্ছে নিত্যসিদ্ধগণের বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য শাস্ত্র অথচ তোমার তার কিছুই জানা নাই।"

মানুষ নয় পরমেশ্বর

সেই সময় গোপীনাথ শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং মহাভারতের যথাক্রমে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং,' 'সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গো'— এই শ্লোক দুটি উল্লেখ করলেন এবং এইভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণসিদ্ধ করে বললেন। "এতেই আমরা জানতে পারি যে কলিযুগে প্রত্যক্ষ অবতার আছে। তিনি নামসংকীর্ত্তন প্রচার করেছেন। তিনি সাধারণ মানুষ নন। তিনি সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণই।

কিন্তু সার্বভৌম বললেন, "না না, তুমি চুপ কর, নিজের চরকায় তেল দাও, আমায় উপদেশ দেওয়া তোমার চলে না। দিতে এসো না।"

এইভাবে শ্যালক-ভগ্নীপতির যুক্তিতর্কে অবসান হল। কয়েকদিন পরে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে বললেন—

"আমি তোমায় বেদান্ত পড়াতে চাই তাতে তুমি সন্ন্যাসের মর্য্যাদা রক্ষা করায় বল পাবে। আমি তোমায় শিখিয়ে দেব যে, এই সংসারটাই মিথ্যা তাতে তুমি আর কখনও সাংসারিক জড় সুখসম্ভোগে লালায়িত হবে না। মহাপ্রভু বললেন,

"আপনি ত' আমার অভিভাবক। আপনি যা বলবেন, তা আমি নিশ্চয়ই করব। আপনার যখনই সুবিধা হবে, আমি এসে বেদান্তদর্শন পড়ব।"

একথা গোপীনাথ শুনতে পেয়ে মহাপ্রভুকে বললেন, সার্বভৌম ত' আপনার আসল স্বরূপ জানতেই পারছে না।

মহাপ্রভু বললেন, কেন তুমি তাঁর নিন্দা করছ। তিনি আমার গুরুস্থানীয়, আমার পিতৃদেবের সহপাঠী। তাই আমার প্রতি তাঁর বাৎসল্য স্নেহ আছে। তিনি আমার অভিভাবকের মত আমার হিতচিন্তা করেন। তাতে আমি তো দোষ দেখি না।

সাতদিনের নীরবতা

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বেদান্ত শিক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল। সার্বভৌম উৎসাহের সহিত বেদান্ত ব্যাখ্যা করে চললেন, আর মহাপ্রভুও একান্ত অনুগত ছাত্রের মত বেদান্ত শ্রবণ করলেন। এই ভাবে সাতদিন কেটে যাওয়ার পর সার্বভৌমের মনে কেমন একটু সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—

"একি কথা! আমার মত একজন বেদান্ত দর্শন, ন্যায়দর্শনাদি শাস্ত্রে সুদক্ষ পণ্ডিত সাধ্যমত বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং নৈয়ায়িক মীমাংসা লব্ধ যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গুলি এমন সরলভাবে ব্যাখ্যা করছি, কিন্তু এ কেমন ছাত্র? কিছুই বলে না, একটা প্রশ্নও কি তার মনে জাগে না? সে ত' কেবল একটা বোবা ছেলের মত কেবল শুনেই চলছে। তবে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারছি এত আদৌ বুঝতে পারছেনা এমন নয়; সেত খুবই তীক্ষ্ণ ধীশক্তিমান, এত সত্যিই, কিন্তু সে ত' কোন ইঙ্গিতই দিচ্ছে না বুঝতে পারছে কি না! এখন কি করা যায়? তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সোজাই জিজ্ঞাসা করলেন—

আমি গত সাতদিন ধরে তোমাকে বেদান্তের কঠিন তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করে চলেছি। অনেক সন্ন্যাসী আমার নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনেছে, এখনও শুনতে আসে। কিন্তু আমার ব্যাখ্যায় একটা প্রশ্নও কর না— কেবল শুনেই চলেছ! একেবারে নীরব! তোমার এই অদ্ভুত নীরবতার কারণ কী?

নাস্তিকের পাণ্ডিত্য

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখন সেই সুযোগ পেয়ে গেলেন, যার জন্য তিনি এতদিন অপেক্ষায় ছিলেন, এইটিই নিজেকে প্রকট করার মাহেন্দ্র মুহূর্ত্ত। তাই তিনি বললেন,

"আপনি এতদিন যা বললেন, তা আচার্য্য শঙ্করের ভাষ্য উপরে আধারিত। আমি শুনেছি ভগবানের আদেশেই আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য গোপন করেছিলেন। বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা বেদব্যাস ত' সম্পূর্ণ আস্তিক; এবং তিনিই বেদান্তের রচয়িতা। কিন্তু আপনি যা এতদিন আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে চাইলেন, সে সবই ত' কেবল নাস্তিকতার ঈশ্বরবিশ্বাসহীনতায় পর্য্যবসিত।"

সার্বভৌম খুবই চতুর ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে তাকে খুব ভদ্র ভাষায় বোকা বানিয়ে ছেড়েছেন, তা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হল না। তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন, আমি সাতদিন যাবৎ এত পরিশ্রম করে বুদ্ধি খাটিয়ে আমার যথাসাধ্য পরিশ্রম করে যা বুঝালাম এ যুবকটি বলল কিনা সব আজেবাজে কথা? এ কি বলতে চায়!

তথাপি সার্বভৌম অত্যন্ত ভদ্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে বললেন, তুমি কি বলতে চাও যে, এই সাতদিন ধরে যা বলেছি, সে সবই অসার অবাস্তব? তা হলে তুমি কি প্রকৃত অর্থ বুঝাতে পার? যদি আমার ব্যাখ্যা সবই মিথ্যা ও অযৌক্তিক, তা হলে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম কি?

তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, আপনি যদি আমাকে আদেশ করেন, তবে চেষ্টা করতে পারি। বেদান্তের সূত্রগুলি স্বতঃপ্রকাশ, স্বতঃপ্রমাণ এর যথার্থ ব্যাখ্যা কেবল পরব্রহ্ম কৃষ্ণকেই উদ্দেশ করে। এইভাবেই মহাপ্রভু তাঁর বক্তব্যের উপক্রম করলেন।

তিনি আরও বললেন "শ্রীমদভাগবতই বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। গরুড়পুরাণে দেখতে পাই,—

অর্থোঽয়ং ব্রহ্ম সূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ।।

বেদান্তসূত্রের প্রকৃত ভাষ্যই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবত। পৃথিবী পৃষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিহাস ও মহাকাব্য একলক্ষ শ্লোক সমৃদ্ধ মহাভারত থেকে তার প্রকৃত নিহিতার্থ অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন; কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতই এমনি একটি শাস্ত্র যাতে বেদান্ত সূত্র অক্ষর ব্রহ্ম প্রণব ও ব্রহ্মগায়ত্রীর আসল মর্মার্থ অতি স্পষ্টভাবে প্রকটিত হয়েছে"। বেদ ও উপনিষদেরও সমস্ত তথ্য ও তত্ত্ব শ্রীমদ্ভাগবতেই বোধগম্য ভাষায় বিবৃত হয়েছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণের পথ ধরেই শ্রুতি ও বেদান্তের উদ্দিষ্ট বাস্তব সত্যের (বেদ্যং বাস্তব বস্তু মত্র শিবদং) সন্ধান পাওয়া যাবে।

যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন, সার্বভৌম ত' নিজে একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি তখন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য অস্বীকার করতে পারলেন না। তাই তিনি বললেন, "হাঁ শ্রীমদ্ভাগবত আমার বেশ ভালই লাগে। আমি তার একটি চমৎকার শ্লোক বিশেষ ভাবেই পছন্দ করি। হয়ত তখন তাঁর মনে নিজের গৌরব কোন মতে তুলে ধরার অভিপ্রায় উঁকি মেরে ছিল। তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "আত্মারামাশ্চ" শ্লোকটির ব্যাখ্যা আরম্ভ করলেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভূত গুণো হরিঃ।।

যাঁরা মুক্তিপ্রাপ্ত আত্মারাম, তেমন বাসনাগ্রন্থিহীন মুনিগণও শ্রীহরির অত্যদ্ভুতগুণে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শ্রীচরণে সমর্পিত হয়ে শ্রদ্ধাভক্তি করে থাকেন, কেননা কৃষ্ণের এইরূপ একটি চিত্তহারী চমৎকার গুণ আছে।

সার্বভৌম এই শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা শ্রীমন মহাপ্রভুকে শুনালেন। মহাপ্রভু-পূর্বের মত নীরবে শুনে গেলেন।

সার্বভৌম ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করে মনে মনে একটু তৃপ্তি বোধ করলেন এই ভেবে "যা হোক, এই নবীন সন্ন্যাসীর কাছে তাঁর নিজের স্থিতি স্বাভিমান্ কিছুটা বজায় রাখতে পারা গেছে।" তবুও ভদ্রতার খাতিরে তিনি বললেন, এ ব্যাখ্যায় তুমি তৃপ্তি পেয়েছ নিশ্চয়, তথাপি তুমি যদি আরও কিছু ব্যাখ্যা করতে চাও, আমি তা শুনতে চাই।" মহাপ্রভু বললেন, "আপনি যদি আদেশ করেন, আমি চেষ্টা করতে পারি।"

তারপরে মহাপ্রভু সার্বভৌমের নয়টি ব্যাখ্যার ধারে কাছে না গিয়েই সম্পূর্ণ ভিন্ন আঠারটি নূতন ব্যাখ্যা শুনিয়ে দিলেন। সার্বভৌম যখন মহাপ্রভুর নিকট ঐ আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা শুনছিলেন, তখন শুনতে শুনতে ক্রমশঃ তিনি অনুভব করলেন যেন তিনি কোথায় তলিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পাণ্ডিত্যের অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে। তিনি অবাক্ হয়ে চিন্তা করলেন — এই বালক — এই যুবক ত' সাধারণ মানুষ নন, কোন মানুষ, সে যতই বুদ্ধিমান্ হোক না কেন, আমার যুক্তিবে খণ্ডন করতে পারে না। আমার নয় প্রকার ব্যাখ্যাকে একপ্রকার ফেলে থুয়ে আঠারো প্রকার অদ্ভুত প্রকার ব্যাখ্যা করে গেল এই একটি সাধারণ শ্লোকের! এ কি? আমার এত যুক্তি সিদ্ধ প্রমাণসহ সব ব্যাখ্যাকে এড়িয়ে রেখে এমন অকাট্য, সুসংগত, দৃঢ় অথচ ভক্তিভাবস্নিগ্ধ সুন্দর ব্যাখ্যা করে গেল! কোন মানুষই আমার ব্যাখ্যাকে অতিক্রম করতে পারে না আমার ধীশক্তিকে পেছনে ফেলতে পারে না। এ ব্যাখ্যা ত' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের! যাবতীয় ভাব-সম্পদই এই ব্যাখ্যার মধ্যে ভরে রয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব হল একটি বালকের মধ্যে? কি আশ্চর্য্য?

অতীন্দ্রিয় পরিপ্রকাশ

সার্বভৌম ক্রমশঃ নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন তখন তাঁর গোপীনাথ আচার্য্যের কথা মনে পড়ল "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

মানুষ নন"। একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে এ প্রকার ব্যাখ্যা কখনই সম্ভব নয়। এত একটি অসাধারণ অপ্রাকৃত ব্যাপার।

এর পরেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু সার্বভৌমকে নিজের আসল স্বরূপ প্রকট করালেন। সার্বভৌম স্থূলচক্ষেই সেই অদ্ভুত প্রকাশ—চতুর্ভুজ নারায়ণ ও দ্বিভুজ মুরলী মনোহর কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন করে কৃতার্থ হলেন। তিনি সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকলেন। মূর্চ্ছিত অবস্থা কেটে গেলে সার্বভৌম দেখতে পেলেন— সেই সৌম্যমূর্ত্তি প্রিয়দর্শন যুবক সন্ন্যাসীটিই তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অতি বিনীত ছাত্রের মত। তারপর মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "আমি কি এখন যেতে পারি?"

সার্বভৌম বললেন, "নিশ্চয়ই, এখন যেতে পার।" মহাপ্রভু চলে গেলেন। সার্বভৌম সেইখানেই বসে থাকলেন। কিছু সময় পরে তিনি প্রকৃতস্থ হয়ে চিন্তা করলেন, "এ কি দেখলাম আমি? চতুর্ভুজ নারায়ণ, তার পর বৃন্দাবনবিহারী দ্বিভুজ বংশীবদন কৃষ্ণ বংশীর মধুর আলাপ গান করছেন।"

— তা হলে আমি ত' কোন সাধারণ মানুষের কাছে হেরে যাই নাই! এই পরাজয়ই আমার পরম সৌভাগ্য।

সার্বভৌম এখন পূর্বের সার্বভৌম নন। তিনি এখন আর এক জন রূপান্তরিত ব্যক্তি। দুটি শ্লোকে বন্দনা গান আরম্ভ করলেন:

> বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগ
> শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ পুরাণঃ।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীর ধারী
> কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।

করুণা সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কমলে আমি আত্মনিবেদন করি। শ্রীমন্ মহাপ্রভুই স্বয়ং পরাৎপর পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। কালের করাল কবলে যে অহৈতুকী শুদ্ধ প্রেমভক্তি ধারা লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল, সেই প্রেমভক্তি ধারাকে তিনি পুনঃ প্রবহমান করেছেন।

> কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
> প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্য নামা।
> আবির্ভূতঃ তস্য পাদারবিন্দে
> গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।।

যিনি স্বয়ং পরাৎপর পরংব্রহ্ম, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী মহাপ্রভুর চরণ সরোজ সুধা সিন্ধুতে আমার চিত্তভৃঙ্গ নিমজ্জিত হউক।

অসমোর্দ্ধ আস্বাদন (Taste Supreme)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, উক্ত শ্লোক দুটি রচনা করে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাহাই প্রকাশ করেছেন।

তার পরের দিনে খুব সকালেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমন্দির থেকে ফেরার পথে মহাপ্রসাদ হাতে নিয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তখনও ভট্টাচার্য্যের ঘুম ভাঙ্গে নাই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু খুব জোর গলায় ডাক ছাড়লেন — "ও ভট্টাচার্য্য মশায়! উঠুন, উঠুন, এই দেখুন কেমন অপূর্ব প্রসাদ এনেছি, এমন স্বাদের প্রসাদ আপনার জন্য এনে দাঁড়িয়ে আছি।"

সার্বভৌম হঠাৎ উঠে পড়ে বাহিরে আসতেই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর হাতে মহাপ্রসাদ দিয়ে দিলেন; আর সার্বভৌম প্রাপ্তি মাত্রেই তা কপালে ঠেকিয়ে মুখে দিয়ে দিলেন; মুখ ধোয়ার জন্য ও বিলম্ব করলেন না। সাধারণত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সকালে উঠে মুখধোয়া, স্নানাদি নিত্যকর্ম, প্রাতঃ সন্ধ্যাদি না করে কিছু এমন কি মহাপ্রসাদ ও গ্রহণ করেন না। কিন্তু সার্বভৌম স্মার্ত্ত বিধি বিধানের উপদেষ্টা গুরু হয়েও মহাপ্রভু প্রসাদ দেওয়ামাত্র ভক্ষণ করলেন এবং মহাপ্রভুও বলতে থাকলেন, "আগেও মহাপ্রসাদ পেয়েছি; কিন্তুএমন স্বাদ-গন্ধ ত' কোন দিন পাই নাই এতেই বুঝছি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ নিজেই একে অধরামৃত করে দিয়েছেন।" সার্বভৌম মহাপ্রসাদ পেতেই শ্লোক পাঠ করলেন:

> শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
> প্রাপ্তি মাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা।।
> ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
> প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ।।

সজ্জনগণ কৃষ্ণের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রেই সেবন করবেন। কোন দ্বিধা করবেন না। মহাপ্রসাদ সেবনে দেশ-কাল-পাত্রের কোন বিচার অনাবশ্যক। ইহাই কৃষ্ণের আদেশ।

আজ আমি বিশ্ববিজয় করেছি

সার্বভৌম প্রসাদ ভক্ষণমাত্রেই প্রভু-ভৃত্য দুইই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণপ্রেমানন্দে আত্মহারা হয়ে নৃত্য করতে লাগলেন। অপ্রাকৃত প্রেমের মদিরায় মত্ত হয়ে উভয়ের মধ্যে অশ্রু, পুলক, স্বেদ-রোমাঞ্চ-বৈবর্ণ্যাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হল।

মহাপ্রভু উল্লসিত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে আরম্ভ করলেন—

"আজ আমি বিশ্ববিজয় করেছি— সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস এসেছে। আমি সার্বভৌমকে রূপান্তরিত করতে পেরেছি। সার্বভৌম কোনও বেদবিধি-বিধান অনুষ্ঠান না করেই মহাপ্রসাদ সেবন করেছে; একি সাধারণ কথা! আজ আমার অবতরণের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।"

সেই দিন থেকেই সার্বভৌম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত আর সবই বিসর্জন দিলেন। কেবল শুদ্ধ প্রেমভক্তি ব্যতীত আর কোন ব্যাখ্যাই তিনি করলেন না। শ্রুতি-স্মৃত্যাদি সব শাস্ত্রের সারমর্ম যে একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই প্রতিপাদন করতে নিজের যাবতীয় শাস্ত্র-পাণ্ডিত্যের সার্থকতা বলে প্রচার করলেন। মহাপ্রভুর তিনি একান্ত অনুগত ভক্তরূপে নিজ জীবনকে সার্থক করলেন। গোপীনাথ আচার্য্য সার্বভৌমের এই অপূর্ব পরিবর্ত্তন দেখে হাতে তালি দিয়ে আনন্দে নৃত্য করতে লাগলেন। তিনি সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কেমন লাগছে।" সার্বভৌম উত্তরে বললেন—

"তুমিই আমার প্রকৃত আত্মীয় বন্ধু। তোমার কৃপায়ই আমি মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করলাম"।

পতিতের বন্ধু — দীন দয়াল

ন্যায় বিচারে যোগ্যতা অযোগ্যতা নির্ণয়ের কথা ওঠে; কিন্তু ভগবৎকৃপা ঐসব যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করে না; তা অহৈতুকী। অযোগ্য ও দুর্বলকেও ভগবৎ কৃপা আত্মসাৎ করে নিজের সেবাযোগ্য করে তোলেন। কেবল আমাদের আন্তরিক লালসাই সেই বিভু কৃপা গ্রহণের জন্য প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু ও রায় রামানন্দ সংবাদে (মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ) পাই—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ

ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে

তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং

জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে।

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি কোটি জন্মের সুকৃতি দ্বারাও লাভ করা যায় না। কেবল একটি মূল্যেই পাওয়া যায়, এবং তা হচ্ছে লৌল্য বা স্বাভাবিক লোভ একান্ত আন্তরিক লালসা।

এই কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতি বা কৃষ্ণচেতনা, (Krsnaconsciousness) এর ফলটা কি? তা হচ্ছে —

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি

শ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মানি

ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।

আমাদের অন্তরের যে রস পিপাসা ও রসানন্দাস্বাদন, তা আমাদের হৃদয়ের বৃত্তি, তা হৃদয়েই থাকে অতি নিগূঢ় সংগোপনে। কিন্তু কৃষ্ণ কথা— কৃষ্ণলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনে সেই রুদ্ধ দ্বারটি খুলে যায়; হৃদয়ে চমক্ লাগে; কৃষ্ণানন্দ রসের ফোয়ারা উথলে পড়ে; কারণ তিনিই ত' 'রসো বৈ সঃ', অখিলরসামৃত মূর্ত্তি।

হৃদয়ই রসের কাঙ্গাল

আমাদের হৃদয়ের লালসাই রস, আনন্দ ও সুখানুভব— চিন্ময় রসাস্বাদ সুখপ্রাপ্তি এ সব মস্তিষ্কের ব্যাপার নয়। তাই প্রেমের রাজ্যে হৃদয়েরই মহত্ত্ব, মস্তিষ্কের নয়।

তার পরের প্রভাব হল জ্ঞানের স্তরে তার অনুভূতি প্রথমে হৃদয়ে, পরে বুদ্ধির ভূমিকায়। রসাস্বাদ পেয়ে গেলে সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটে "রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে"।

আমরা যখন ঐ চিন্ময়রসের একটু আস্বাদ পেয়ে যাই, তখন হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমের রসসুধাধারায় সর্বাত্ম স্নপিত হয়ে যায় এবং হৃদয় তৃপ্তি পেয়ে বলে উঠে, "হাঁ এই ত' এত দিন চেয়েছিলাম।" তখন মন-বুদ্ধি সায় দেয় ঠিকই ত' আর কি কোন সন্দেহ আছে! এইটিই আমার চরম প্রাপ্তি, আর সবই ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যাক। প্রেমের আস্বাদ চেখেছি, আর আমার করার কিছুই নাই। সকল ইন্দ্রিয় থেমে যায় কর্মের সমাপ্তি ঘটে। কারণ, হৃদয়ের একমাত্র সম্পদ, যে কৃষ্ণপ্রেম, তাতেই হৃদয় ভরপুর হয়ে যায়।

কৃষ্ণকৃপার, গুরুকৃপার এইটাই স্বভাব যে, তা পাওয়ার পর আর কিছুই পাওয়ার থাকেনা, আর কোন বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন, তার কাছ থেকে সরে দাঁড়ায়।

সুতরাং আমাদের একমাত্র অভীপ্সা — একমাত্র লালসা এই কৃপা। তা যদি অন্যাভিলাষ শূন্য হয়, খাঁটি হয়, ভেজাল এমন কি মুক্তি কামনারূপ ভেজাল না থাকে, তবে সবটাই পাওয়া যায়— কারণ কৃষ্ণ কৃপা— ভক্ত কৃপা তা যোগ্য অযোগ্য বিচার রাখে না। আর যাদের ঐ লালসা জাগ্রত হয় নাই, তাদের কি গতি হবে? তারা কি উদ্ধার পাবে না?

হ্যাঁ তাদের জন্যও শ্রীগৌরাঙ্গ বিশেষ ব্যবস্থা করে রেখেছেন— তাঁর এই অনর্পিত প্রেম অবিচারে বিতরণের ভার দিয়েছেন শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর উপর। শ্রীনিত্যানন্দ এমন একটি দাতা যে, তিনি না চাইলেও প্রেম দিতে পাগল। যদি কেউ বলে, আমি ও সব প্রেম -টেম চাই না, তাকেও শ্রীনিতাই বলেন, "তা হবে না, তুমি চাও না চাও, তোমাকে নিতেই হবে। নাও নাও, একটু চাখলেই তুমি এর কি মূল্য, এযে কত তোমারই হৃদয়ের বৃত্তি, তা তুমি ঠিকই বুঝতে পারবে কৃষ্ণপ্রেম যে কি তা তুমি অন্তরে অনুভব করে ধন্য হয়ে যাবে।"

যে কোন চতুর ব্যবসায়ী তার দ্রব্য বাজারে চালু করার জন্য প্রথমে বিনা মূল্যে নমুনা স্বরূপ বিতরণ করতে থাকে এবং গ্রাহকদের বলে, নিয়ে ব্যবহার করুন, কোন দাম দিতে হবে না। যদি ব্যবহার করে ভাল ফল পান, তবে কিনে নিতে পারেন। পরে দেখা যায়, প্রত্যেকেই সেই দ্রব্য ক্রয় করছে।

ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সমগ্র বঙ্গদেশে ভ্রমণ করলেন। প্রতি দ্বারে দ্বারে গিয়ে তিনি পায়ে ধরে বলতে লাগলেন, "আমি যেচে দিতে এসেছি, ফিরিয়ে দিও না। যা বলছি তাই করো ভাই।

ভজ [illegible] কহ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।।"

এই ভাবে নিতাই গঙ্গার দুইপারে গ্রামে গ্রামে নেচে নেচে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে গৌরাঙ্গের কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ করতে লাগলেন।

দ্বাপরে কৃষ্ণলীলায় বলদেব কৃষ্ণের রাসলীলায় সহায়তা করেছিলেন। সেই বলদেব এখন কলিযুগে গৌরাঙ্গের সংকীর্ত্তন প্রচারলীলায়ও প্রধান সহায়ক হলেন। তিনি একান্ত ভাবে কৃষ্ণের অনুরক্ত সমর্পিত সহচর। বাহ্যত তিনি ব্রজলীলায় নিজে রাসলীলা করলেও অন্তরে তিনি কৃষ্ণেরই রাসলীলা সহায়কই ছিলেন, নিজের ভোক্তৃ-অভিমান তাঁর ছিল না। কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যই তাঁর একমাত্র কাজ এবং এই কাজের জন্যই তিনি কৃষ্ণের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের প্রত্যেক পরমাণুই কৃষ্ণসুখের জন্য উদ্দিষ্ট। ঠিক সেই রূপে নবদ্বীপ লীলায়ও তিনি গৌরাঙ্গের সেবাসুখ সাধনের জন্য কায়মনোবাক্যে সর্বাত্মসমর্পিত।

সিংহাসন থেকে নেমে এস!

একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জননী শচীমাতা একটি স্বপ্ন দেখলেন, "শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সিংহাসনে বসেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ হঠাৎ এসেই বলদেবকে বললেন, তুমি নেমে এস, তোমার কাজ শেষ হয়েছে, এখন সেখানে গৌরাঙ্গ — আমার প্রভুই বসবেন। বলদেব কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি বললেন আমার প্রভু কৃষ্ণই বসে আছেন। আমি নামি কি করে।

তখন হাতাহাতি আর কি! নিত্যানন্দ বলদেবকে টেনে নামিয়ে আনলেন আর বললেন, বলছি তোমার দিন ফুরিয়েছে? এখন আমার প্রভু গৌরাঙ্গের পালা, তুমি এখন জবরদখলদার, তোমার এখন ওখানে বসা ত অবৈধ, নেমে এস, বলেই সঙ্গে সঙ্গে নিতাই বলদেবকে টেনে নামিয়ে দিলেন।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দের সম্পর্ক এইরূপই। তাঁর নিজের কোন

পৃথক্ সত্তাই নাই। তাঁর সমগ্র সত্তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুতে পর্য্যবসিত ঠিক যেমন বলদেবের সমগ্র অস্তিত্বই কৃষ্ণের সুখের জন্য সমর্পিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই হল ব্রজের প্রেমভক্তিরসামৃত উদারভাবে কলিযুগে বিতরণ করা আর নিত্যানন্দ সেই কাজই করে চললেন একটু অন্যভাবেই। তিনি বললেন—

"ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম
যেই জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণ"

গৌরাঙ্গের ভজন কর, গৌরাঙ্গের কথা বল, গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন কর, — এই করলেই ব্রজের প্রেমভক্তি লাভ করা অনায়াসে হবে। কান টানলেই মাথা আপনি আসে। গৌরাঙ্গকে ধরতে পারলে, রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনুকে ধরতে পারলে, কৃষ্ণপ্রেম ত' হাতের মুঠোয়।

শ্রীচৈতন্যের অবির্ভাব স্থলী নবদ্বীপধাম কোন দিক্ থেকেই বৃন্দাবন ধামের কম নয়। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজধাম এবং রাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বসতি নবদ্বীপ ধাম এক ও অভিন্ন। বৃন্দাবনে যে সর্বোচ্চ স্তরের প্রেমভক্তিরসধারা নিরন্তর প্রবহমান, নবদ্বীপ ধামেও সেই প্রেমভক্তি ধারাই অন্যরূপে প্রবহমান। কোন ভক্ত বৃন্দাবন বাসকেই পছন্দ করেন, কোন কোন ভক্ত নবদ্বীপ ধামকেই, আবার কোন কোন ভক্ত উভয় ধামেই সমভাবে প্রীতি যুক্ত। তবে নবদ্বীপ ধামের ঔদার্য্য অধিক। বৃন্দাবনে কৃষ্ণের লীলাখেলা কেবল একান্ত অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধ ও সাধনসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যে সীমিত। কিন্তু কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গের নবদ্বীপ লীলার মধ্যে কি পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য অন্তর্নিহিত, তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় (চৈঃ চঃ মধ্য ২৫।২৭১) এই প্রকার :

কৃষ্ণলীলামৃত-সার তার শতশত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে।।

করিরাজ গোস্বামী বলেন, কৃষ্ণলীলায় যে আমরা সর্বোত্তম স্তরের লীলারস অস্বাদন করতে পারি, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই, এখানে নবদ্বীপে কিন্তু সেই লীলারস-সরোবর দ্বার সবদিকেই খোলা; অসংখ্য প্রণালীর ধারা দশদিকেই প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আমাদের সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ লালসা হচ্ছে শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা রাধাদাস্য। তা লাভ করার জন্য সর্বাগ্রে চাই নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দের প্রতীভূ গুরুপাদপদ্মের সেবাদাস্য এবং এইটাই তার ভিত্তিভূমি (Foundation)। এই ভিত্তিভূমিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করেই ক্রমপন্থায় অগ্রসর হতে হবে। তাই নিত্যানন্দ প্রভু অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের করুণা লাভ করাই আমাদের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। এই প্রকার সাধনপথেই চরমে রাধারাণীর সেবাধিকার পাওয়া যাবে। "নিতাই এর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে"।

আমাদের গৌড়ীয় দর্শনের, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার সার কথা হল— স্বরূপাবস্থান— যেখান থেকে চ্যুত হয়ে গেছি, সেইখানে সেই অবস্থা আবার ফিরে পাওয়া অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারাণীর দাসের দাসের দাস হওয়া (দাসী হওয়া)। আমরা কৃষ্ণ হতে চাই না;কৃষ্ণের সঙ্গে মিলে যেতে চাই না;আমরা সেবা পেতে চাই— সেবা করতে চাই।

পরমব্রহ্মপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের বা ভগবানের পূর্ণতম সত্তাই হচ্ছে অর্দ্ধাংশ সেব্য ভগবত্তা, অর্দ্ধাংশ সেবক ভগবত্তা। এক কথায় শক্তিমান ও শক্তি, দুই মিলেই পূর্ণ ভগবত্তা। অর্দ্ধাংশ সেব্য-ভোক্তৃ-ভগবত্তা অন্য অর্দ্ধাংশ সেবক বা ভোগ্য ভগবত্তা অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান— দুই মিলে পূর্ণ ভগবত্তা। আমাদের স্বরূপই হল ভোগ্য বা বশ্য ভগবত্তার অনুঅংশ বিশেষ। আমরা স্বরূপত ভোক্তা নই— সেব্য নই, ভোগ্য বা সেবকসত্তার অণুঅংশ। আমরা শক্তিতত্ত্বেরই অংশাংশ।

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায়ই আমরা গৌরাঙ্গের কৃপা পাব এবং তার ফলে শ্রী রাধাগোবিন্দের সেবা পাব, সর্বোত্তম সর্বোচ্চ স্তরের সেবাসৌভাগ্য লাভ করব। অন্য পন্থায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা করতে গেলে অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়ে সোজাসুজি (direct service) রাধা-গোবিন্দের সেবা করতে গেলে তা কৃত্রিম ও অসম্পূর্ণ হবে। সুতরাং আমরা নিত্যানন্দ গুরুদেবের আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমেই গৌরাঙ্গ, তারপরে রাধামাধবের যুগল সেবার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছাতে পারব।

শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতী ঠাকুর প্রার্থনা করে বলছেন—

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে
বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ
রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ।।

সেই জন্য আমরা গৌরাঙ্গের পদারবিন্দে যতই ভক্তি লাভ করব, ততই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধারাণীর সেবারসসুধা আস্বাদন করতে সমর্থ হতে পারব। নবদ্বীপ ধামে যা জমা রাখব, তা বৃন্দাবনধামের হিসাব খাতায় উঠে যাবে। তা যে কিভাবে কখন গিয়ে বৃন্দাবনে হাজির হয়েছে, তা সে নিজেও জানতে পারব না। স্বয়ং রাধারাণীই তার কাছে এগিয়ে এসে বলবেন, "তুমি তা হলে নবদ্বীপ থেকেই সুপারিশ পত্র নিয়ে এসেছ। বেশ বেশ, তুমি তা হলে এখনই আমার সেবায় নিযুক্তি পেয়ে যাবে। গৌরাঙ্গের সুপারিশপত্র ত' যা-তা হবার নয়। তাতে ইন্দ্রিয়াসক্তির লেশমাত্র থাকতে পারে না। কারণ, নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ একে সন্ন্যাসী তদুপরি ভক্তের লীলা করছেন।

আরও আমরা যদি আর একটু তলিয়ে দেখতে চাই, তবে নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ ত' নিজে কৃষ্ণই রাধারাণীর ভূমিকায় লীলা প্রকট করেছেন।

নির্বিশেষবাদীগণের বিচারে অন্বয় ও ব্যতিরেক বিভাব একত্র হয়ে যায়, তখন তা অদ্বয়তত্ত্বে পরিণত হয় অর্থাৎ যখন অনুঅংশ জীব ও ভূমা স্বরূপ ব্রহ্ম একস্তরে পৌছে যায় তখন জীব ব্রহ্মে লীন হয়ে এক অদ্বয়তত্ত্বে পরিণত হয় এইটাই তাদের মতে সাযুজ্য মুক্তি এবং এই মুক্তিই সাধনের শেষ অবস্থা।

বৈষ্ণব দার্শনিকগণ কিন্তু তা বিচার করেন না। তাঁরা বলেন, জীব ব্রহ্ম এক হয় না, জীব ব্রহ্মের ভূমিকায় পৌছলেও তার স্বতন্ত্র জীব-সত্তা পৃথক্ থেকে আরও সেবকভাব, দাস্যভাব ঘনিষ্ঠ হয়ে যায়, সে আরও নিবিড়ভাবে পরংব্রহ্ম পূর্ণসত্তার প্রেমসেবা করতে পারে। শক্তিও শক্তিমানের অদ্বয়ত্ব এই প্রকার। এই ভূমিকায় শক্তিতত্ত্ব আরও নিবিড়ভাবে শক্তিমানের প্রেমসেবা করে।

এই প্রকার অদ্বয় তত্ত্ব অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত বিগ্রহই শ্রীগৌরাঙ্গ—রাধা-গোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু।একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের নিত্যানন্দ অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের একান্ত শরণাগতি ও সেবা লালসার দ্বারাই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীরাধা-গোবিন্দের প্রেমসেবা করতে পারি।

আচণ্ডালে কোলে নেয় নিত্যানন্দের দয়া

সময় বিশেষে নিত্যানন্দের দয়া চৈতন্য মহাপ্রভুকেও ছাড়িয়ে যায়। কেউ হয়ত এটাকে একটা অনাবশ্যক বা মাত্রাধিক্য বলে মনে করতে পারেন। কারণ, এমনও দেখা যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অত্যাধিক অপরাধীকে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। কারণ তাকে সবদিকটাকে নজর রাখতে হয়, ভারসাম্য (balance) বজায় রাখতে হয়।

কিন্তু নিত্যানন্দের সেসব বালাই নাই; তিনি ঐ সব খাতির করেন না — বিচার

করেন না। নির্বিচারে প্রেম দেওয়াই নিতাই এর স্বভাব। কৃপা বিতরণে তিনি মুক্তহস্ত যাকে বলে একেবারে অন্ধ, যোগ্য-অযোগ্য কোন বিচারই তাঁর নাই। এমন কি মহাপ্রভুও যাকে নিরাশ করেন, তাকেও নিতাই বাহুতুলে কোলে নেন। তখন মহাপ্রভুও নিরুপায়; নিতাই চাইছে তাই কৃপা না করে যাবেন কোথায়!

তাই নিতাই এর করুণা উদারতায়-বিশালতায় সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর এইটিই আমাদের মত পতিত জীবের একমাত্র আশা ভরসা; যত পতিতই হই না কেন নিতাই এর করুণায় একেবারে সর্বোচ্চ স্তরেও পৌঁছাতে পারি।

এক সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অনুগতগণের কাছে বলে ফেললেন—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিনু তোমারে।। (চৈঃ ভাঃ)

জাগতিক দৃষ্টিতে নিত্যানন্দ প্রভুর কদাচার কদাচারই নয়। যদি কেহ নিত্যানন্দের কৌপীনের একটি টুকরাকে মস্তকে ধারণ করে, সেও সর্বপাপ মুক্ত হয়ে পরম পবিত্র হয়ে যাবে। তাই এস আমরা প্রার্থনা জানাই,—

"আমার মন যেন সদাই নিতাই এর পাদপদ্মে লেগে থাকে। আমি তাঁর চরণে নিরন্তর প্রণতি জানাই।" আমরা ত' মায়ার কবলে ফেঁসে গিয়েছি।

এমন জীবকে উদ্ধার করার জন্য মায়া পিশাচীর কবল থেকে মুক্ত করার জন্যই মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিলেন। তিনি পতিত জীবের পেছনে ছুটে চললেন তাদেরকে কৃষ্ণনাম শুনিয়ে মায়ার ফাঁশ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য; আর নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর ছায়ার মত সর্বত্র তাঁর পেছনে ঐ কাজেই ছুটে চললেন। তিনি মহাপ্রভুতে নিজেকে এক করে নিলেন তাঁর ঐ মহৎ কাজে।

শ্রীক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একান্তভাবে সদাই শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলামাধুর্য্যাস্বাদনে নিমগ্ন থাকতেন, অথচ তার মধ্যেই অতি দীনাতিদীন পতিত জীব কি করে মায়ামুক্ত হয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলারস আস্বাদন পাবে, তার জন্য চিন্তিত থাকতেন। তাই তিনি নিত্যানন্দকে বললেন, তুমি যাও বঙ্গদেশে সেখানে সকলকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলারস বিতরণ কর, সকলকে রাধাকৃষ্ণের নাম লওয়াও। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভু বাংলায় গিয়ে কৃষ্ণনামের পরিবর্ত্তে সকলকে গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়ে বেড়ালেন।

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সেই আমার প্রাণরে।" তাঁর উদ্দেশ্য হল "গৌরাঙ্গের নাম কীর্ত্তন করলেই সকলের পাপতাপ দূর ত' হবেই আর তখনই কৃষ্ণলীলারসও

পেয়ে যাবে। দুইই সহজেই হয়ে যাবে তাই আমরা আবার নিতাই এর কৃপা প্রার্থনা করি—

"হে নিত্যানন্দ প্রভু! হে শ্রীগুরুদেব, আমায় শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে একবিন্দু শ্রদ্ধা রতি দান করুন, কারণ তিনিই ত' শ্রীবৃন্দাবন-রাসরস রসিকমূর্ত্তি শ্রীরাধাগোবিন্দ মিলিত তনু। একটু কৃপা করুন, যাতে আমি সেই ব্রজধামে সেই প্রেমরসসেবা লাভ করতে পারি।"

আমরা যদি শ্রীগৌর-নিতাই এর আশ্রয় না নিই তবে ত' আমরা রাধাগোবিন্দ সেবা স্বপ্নেও পাবনা। আমাদের বাস্তব সেবা কেবল কল্পনাতেই থেকে যাবে। নিত্যানন্দ প্রভু ত' অতি পতিত, অতি দুর্গতগণের একমাত্র আশা-ভরসা। গুরুতত্ত্বগণের মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুই সর্বাপেক্ষা ঔদার্য্য বিগ্রহ। তাই তাঁরই সর্বতোভাবে আশ্রয় নিতে হবে — তাঁরই শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করতেই হবে।

বৈকুণ্ঠ-গোলোক ধামে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সংকর্ষণ রূপে বিরাজমান। সর্বসত্তার মূল ভিত্তিভূমিই ত' একমাত্র তিনি, তিনিই মূল বলদেব, পরতত্ত্বের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও সৃষ্টি সম্ভারের মূলাধার। অথচ তিনিই নিত্যানন্দরূপে গুরুরূপে রাস্তায় নেচে নেচে প্রেমের অশ্রু ঝরিয়ে কেঁদে কেঁদে বলে চলেন:

"গৌরাঙ্গের নাম লও, আমাকে কিনে নাও।"

তাই ত' বলি তিনি যতই দৈন্য দেখিয়ে যাই বলুন না কেন, তিনিই ভক্তিপথের সর্বোচ্চ পদাধিকারী আমরা তাঁর চরণেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলে আমাদের জীবন সার্থক হবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দ তত্ত্বের সম্যক্ ও পর্য্যাপ্ত আলোচনায় দেখতে পাই বলদেব নিত্যানন্দই যাবতীয় সৃষ্টির আধার কৃষ্ণলীলার যাবতীয় উপকরণের আধার তাই নিত্যানন্দ ও তদভিন্ন গুরুদেবের সর্বনিবেদনাত্মক চরণাশ্রয়ই আমাদের একমাত্র সাধন সম্পদ।

কৃষ্ণ প্রেম — জীবের অমূল্য সম্পদ

সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদাতাগণের চেয়ে প্রেমদাতাই সর্বশ্রেষ্ঠদাতা। কারণ সৃষ্ট জগতে, দেবলোকে, বৈকুণ্ঠে যত সম্পদ আছে, ভগবৎপ্রেম-কৃষ্ণপ্রেমই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রেমপ্রাপ্তিই সর্বোচ্চ প্রাপ্তি। আমরা যদি স্বীকার করে নিই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের চেয়ে অধিক উদার-অধিক দয়ালু, তা'হলে একথাও

স্বীকার করতে বাধা নেই যে, শ্রীবলরামের চেয়ে শ্রীনিত্যানন্দ অধিক দয়ালু। অন্য সমস্ত ব্যাপারে দুই যুগলই (কৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্য এবং বলরাম ও নিত্যানন্দ) সমান-অভিন্ন। বলরামে ঔদার্য্য ভাব অধিক হলেই তিনি নিত্যানন্দ হয়ে যান।

কৃষ্ণপ্রেমের ভগবৎপ্রেমের স্থান কত উর্দ্ধে সে সম্পর্কে সাধক হৃদয়ে দৃঢ় নিশ্চিত হওয়া দরকার। উচ্চস্তরের সাধুগণ অর্থাৎ উত্তম অধিকারী ভক্তগণ ধর্মার্থকাম ত' দূরের কথা, তাঁরা মুক্তিকেও প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা প্রেমের একবিন্দুর আস্বাদ পেয়ে গেলে বাকী সবই পরিত্যাগ করে থাকেন। সুতরাং প্রেমের স্থান যদি এত উর্দ্ধে তবে সেই প্রেম যারা অযাচিত ভাবে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করেই দিয়ে থাকেন তবে তাঁরা ত' সব চেয়ে বড় দাতা "ভূরিদা জনাঃ"।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই বিশ্বের যাবতীয় চেতন জীবের পরমাত্মা। গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা আর কারণোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন এই বিশ্ব ব্যতীত আর যত অসংখ্য বিশ্ব রয়েছে সেই সমগ্র বিশ্বের পরমাত্মা। এই সমস্ত বিষ্ণুর মূল হচ্ছেন মহাবিষ্ণু, তিনি বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণ। স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলদেব। শ্রীবলদেবই অন্যরূপে মহাবিষ্ণু নারায়ণ।

আর নিত্যানন্দরূপে বলদেবই অবতীর্ণ হন যখন কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যখনই শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ন হন, বলদেবও তাঁর লীলাসঙ্গী রূপে মনুষ্য দেহ ধারণ করে নিত্যানন্দ রূপে অবতীর্ণ হন, উদ্দেশ্য অবিচারে প্রেম বিতরণ। গৌরাঙ্গকে সকলের কাছে বিলিয়ে দেন তিনিই। নিত্যানন্দের নরলীলার ক্রমিক ঘটনাগুলির আলোচনা করলে আমরা তাঁর লীলারহস্যের মর্ম অবগত হতে পারব।

নিত্যানন্দ বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে অবতীর্ণ হন। সেইখানেই তাঁর বাল্যলীলা প্রকট হয়েছিল। তাঁর পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী সকলেই তাঁর বাল্যলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করে চমৎকৃত ও বিস্মিত হতেন, তাঁর প্রতি সকলের অপূর্ব প্রীতিসহ তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল।

একদিন এক সন্ন্যাসী এসে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। বিদায় হওয়ার সময় তিনি নিত্যানন্দকে তাঁর সঙ্গে চেয়ে নিলেন। সেই সন্ন্যাসী ছিলেন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। তাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ ভারতের প্রায় সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করেছিলেন।

একদিন শ্রীনিত্যানন্দ অনুভব করলেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেছেন। অন্তরে ঐ প্রেরণা পেয়ে তিনি এসে নবদ্বীপ ধামে উপস্থিত হলেন।

ঠিক সেই দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একটি অসাধারণ স্বপ্ন দেখে তাঁর ভক্তগণকে বললেন, "আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম যে, একজন মহাপুরুষ একটি তালধ্বজ রথে এসে আমার দ্বারে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন "নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী কোনটী? এই প্রশ্ন তিনি অনেকবার উচ্চারণ করলেন। তিনি নিশ্চয়ই কাল রাত্রে নবদ্বীপে এসেছেন। তাঁকে খুঁজে নিয়ে আসুন।"

ভক্তগণ অনেক অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু কোথায়ও খুঁজে পেলেন না। তারপর মহাপ্রভু "তবে আমিই যাই"— এই বলে তিনি সোজা গিয়ে নন্দন আচার্য্যের ঘরে পৌঁছালেন। উপস্থিত হয়েই তিনি দেখলেন যে নিত্যানন্দ প্রভু নন্দন আচার্য্যের ঘরের বারান্দায় বসে আছেন।

নিত্যানন্দ কিছু সময় ধরে মহাপ্রভুর পানে চেয়ে রইলেন, কেমন যেন ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এইভাবে একদিনের মধ্যেই তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্যতম অতি অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে সকলের দ্বারা পূজিত হলেন।

এরপরে মহাপ্রভু যখন নিত্যানন্দ প্রভুকে কৃষ্ণপ্রেম বিলাতে আদেশ দিলেন, তিনি তা না করে গৌরাঙ্গ-নাম, গৌরাঙ্গ-প্রেম বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন অধম পতিত জীবের কাছে। এমন দয়াল নিতাই এর চরণে প্রণাম নিবেদন করবই।

শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান কালে একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে কিছু কথা গোপনে বললেন। তার পরেই নিত্যানন্দ প্রভু বাংলাদেশে এসে কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবা ও বসুধাকে বিবাহ করলেন। গোপন কথা এই যে, শ্রীমহাপ্রভুই শ্রীনিত্যানন্দকে বিবাহ করে নাম-প্রেম প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করেন নি। তাঁর পক্ষে বিবাহ করা না করা সমান। নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ এসব তর্ক তাঁর বেলায় খাটে না। তিনি এসবের অতীত।

এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন। সে সময় সন্ন্যাস গ্রহণ করা ক্বচিৎ দেখা যেত। সমাজের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখা সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে উদার সাধন ধারা অর্থাৎ নাম সংকীর্ত্তন যা কি কলিযুগের জন সাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ অথচ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পন্থা, তা সেকালে গৃহস্থ না হয়ে গৃহস্থ সমাজে প্রচার করা কঠিন ছিল। সন্ন্যাসী যদি বেশীকরে গৃহস্থদের সঙ্গে মেলামেশা করেন, তবে তাঁর আচরণে কটাক্ষ করার সম্ভাবনা বেশী। কারণ সন্ন্যাসী ত' একগ্রামে, একগৃহে কেবলমাত্র একদিনই থাকবেন তার বেশী থাকা তখনকার সন্ন্যাসী বা ত্যাগীদের পক্ষে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল।

কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁর নাম-সংকীর্ত্তন প্রচার পন্থাকে সমাজের সর্বস্তরের লোকের কাছে পৌছাতে চেয়ে ছিলেন। বিশেষত অভিজাত গৃহস্থগণ নাম সংকীর্ত্তন পন্থাকে ততটা গুরুত্ব দিতে কুণ্ঠিত ছিল তা ত' মহাপ্রভু নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন, তাই নিত্যানন্দ প্রভুকে বিবাহ করে আচার্য্য হয়ে প্রচার করার প্রেরণা দেওয়া তখন দরকার ছিল। কার্য্যত দেখা গিয়েছে নিত্যানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পরেও জাহ্নবা দেবী তাঁর পুত্র বীরচন্দ্র প্রভু সমগ্র বঙ্গদেশকে নামসংকীর্ত্তন বন্যায় ভাসিয়ে দিয়ে ছিলেন তার জেরে পরবর্ত্তী তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত সেই সংকীর্ত্তন বন্যায় ভাটা পড়ে নি।

এখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কিভাবে শ্রীজাহ্নবা দেবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেন, তার বিবরণ ভক্তিরত্নাকরেই বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়।

বিবাহ করার পূর্ব ঘটনা মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে প্রচার আরম্ভ করলেন। এক সময় তিনি প্রচারের জন্য জাহ্নবাদেবীর পিতা সূর্য্যদাস পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হলেন। সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত পূর্বথেকেই গৌর-নিত্যানন্দের প্রিয় অনুগত শিষ্য ছিলেন। তাই সূর্য্যদাস নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁর প্রচার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করলেন। তাঁর গৃহেই নিত্যানন্দ প্রভু বাস করে প্রচার কার্য্য করতেন।

সেই সময়ই সূর্য্যদাস তাঁর কন্যা জাহ্নবাদেবীকে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে জাহ্নাবাদেবী নিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যসিদ্ধা লীলা-সঙ্গিনীই ছিলেন।

তবে এখানে একটা কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর নজির দেখিয়ে অনেক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বিবাহ করেছেন। কিন্তু তাঁদের এটাও জানা প্রয়োজন যে, নিত্যানন্দ প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তার কোন প্রমাণ নাই। এখনকার মত তখনও ব্রহ্মচারীদের নামের সঙ্গে আনন্দ, স্বরূপ, চৈতন্য প্রকাশ প্রভৃতি ব্রহ্মচারী নামের পরে যোগ করা যেত। তবে 'আনন্দ' শব্দ সন্ন্যাসীর নামের পরেও যোগ করা যেত।

কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কোন সন্ন্যাস গুরুর নাম কোথাও উল্লেখ দেখা যায় না। মাধবেন্দ্রপুরী তাঁর দীক্ষাগুরু ছিলেন এবং তিনি অদ্বৈতাচার্য্য ও ঈশ্বরপূরীরও গুরু ছিলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর নামের সঙ্গে 'অবধূত' শব্দ যোগ থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু "অবধূত" শব্দের অর্থ যিনি বিধি নিষেধের অতীত। সাধারণ বিচারে অকরণীয় কার্য্যও অবধূত করে থাকেন। 'অব' অর্থ নীচ, ধূত অর্থ যিনি পবিত্র করেন, নীচ বা

অপবিত্রকে যিনি পবিত্র করেন অথবা যাঁরা অতি উচ্চ স্তরের সাধক বা সিদ্ধ, তাঁদের আচরণে সময় বিশেষে কদাচার দেখা গেলেও, তাঁরা নিত্যই শুদ্ধ বা পবিত্রই থাকেন। (শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার "অপিচেৎ সুদুরাচারো" শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একদণ্ডী সন্ন্যাসী দণ্ডকে তিনখণ্ড করে ভাসিয়ে দিলেন। তার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, দণ্ড যদি নিতে হয় তবে কায়-মন-বাক্যকে দণ্ডিত করার প্রতীকস্বরূপ 'ত্রিদণ্ড' গ্রহণ করা উচিত। তাই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর নিত্যানন্দ প্রভুর ঐ আচরণে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ডী-সন্ন্যাসী প্রথা প্রচলন করে তাঁর শিষ্যগণকে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করেন এবং সেই অনুসারে তাঁর অনুগত শিষ্যগণ সমগ্র পৃথিবীতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রদান করছেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়েও এখন ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

ভুল ধারণার নিরাকরণ চাই — দূর করা চাই

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আভিমুখ্য বা কর্মপন্থা এক প্রকার ভিন্নধরণের তাঁর কৌশলটা ছিল সর্বপ্রথমে যে ব্যক্তিটা সমাজে সবচেয়ে খারাপ, দুরাচার অতি পতিত, তাকেই প্রথমে তুলে নেওয়া। ঠিক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত— প্রথমে শত্রুর অভেদ্য দুর্গকে আক্রমণ করে পরাস্ত করা।

আমাদের একটা বদ্ধধারণা থেকে গিয়েছে যে সন্ন্যাসী হওয়া মানে মায়ার সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়া। কোথায় একটা নির্জন গোঁফায় বসে চোখবুজে ধ্যান করা। ভারতের সাধুগণ সাধারণভাবে প্রচার করে— "সব ছেড়েছুড়ে নির্জন স্থানে চলে যাও, অরণ্যের ভেতর একটা গোঁফা খুঁজে নিও, আর পুরোদমে ভগবান্‌কে ধ্যান কর।"

কিন্তু আমাদের গুরুদেব ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মত তিনি বলতেন, এক সেনাপতির মত মায়াকে আক্রমণ কর। তিনি মায়ার বিরুদ্ধে যাবতীয় তথাকথিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুংকার দিয়ে বলতেন, "ঈশবাস্যমিদং সর্বং', সবই কৃষ্ণের, যা কিছু দেখছ, সবই কৃষ্ণের সেবার জন্য, আমার ভোগের জন্য নয়। এটা আমার ওটা কৃষ্ণের এ প্রকার ভ্রান্ত ধারণাকে কেন প্রশ্রয় দেওয়া হবে এর উপর আঘাত হানো — এ ভ্রান্ত মতকে দূর করে দাও।"

তিনি আমাদের বলতেন, কীর্ত্তন মানে এই ভ্রান্ত মত, মহোগ্রস্ততার সঙ্গে বিরোধ, এর নামই প্রচার। দ্বারে দ্বারে গিয়ে কৃষ্ণচেতনাকে প্রচার কর।

কৃষ্ণানুসন্ধান কৃষ্ণ সুখানুশীলনের বার্ত্তা প্রচার কর। যদি তারা বুঝতে পারে যে

সবই কৃষ্ণ সুখের জন্য তা হলে তারা বেঁচে যাবে উদ্ধার পেয়ে যাবে। এত অতি সরল সত্য কথা, এটা তারা কেন বুঝতে পারবে না!

এই বিচারে আমরা কোন দিক্ থেকে ভয়ের কারণ কিছুই দেখিনা। কোন একজন নির্জন ভজন প্রয়াসী বৈষ্ণব আমাদের গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি কোলকাতায় কেন থাকেন; ওটা ত' শয়তানের আড্ডা, ওখানে কেবল নিজের স্বার্থের জন্য, ভোগকরার জন্য অহরহ প্রতিযোগিতা, সে স্থান ছেড়ে দিয়ে ধামে চলে আসুন।"

কিন্তু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সে কথায় কান দিলেন না। তিনি বললেন "আমি ত সবচেয়ে দূষিত যায়গায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কথা প্রচার করতে চাই।"

এই কারণেই তিনি পাশ্চাত্য দেশে লোক পাঠাতে চেয়েছিলেন— "পাশ্চাত্য সভ্যতার আপাত চাকচিক্যে আকৃষ্ট ও মোহগ্রস্ত হয়ে এদেশের লোক তার অনুকরণে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আগেই ধ্বংস করতে হবে। তা হলে এদেশের কাছে তার আপাত সুন্দর রূপের মোহ কেটে যাবে; তার ফলে তারাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচারে যোগ দেবে।"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই রকমই উৎসাহ ছিল। তিনি গোড়া থেকেই জগতের পতিতউদ্ধার ব্যানার উড়িয়ে তাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আকৃষ্ট করার পথ বেছে নিয়েছিলেন।

পাগল নিমাই পণ্ডিত

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপে প্রকট সময়ে বাংলায় তথা নবদ্বীপ ধামে কৃষ্ণচেতনার কোন নামগন্ধই ছিল না। সাধারণ জনতা, এমন কি তৎকালীন বিদ্বান পণ্ডিতগণও কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণ ভজনের পরিবর্তে বিড়ালের বিবাহে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। ধর্মাচরণের মধ্যে বিষহরি, কালী, চণ্ডী-চামুণ্ডার বা বাসুলী পূজায় ধুমধাম করে মেতে থাকতেন, কিন্তু কৃষ্ণনামের কোন বালাই ছিল না। অতিকম দু-চারজন হিন্দু গৃহস্থ গঙ্গা স্নানের সময় গোবিন্দ, হরি, কৃষ্ণ শব্দ উচ্চারণ করতেন। আর নবদ্বীপ শহরে তখন মুসলমান কাজী শাসন করতেন। তাঁর দাপটে হিন্দুয়ানী করা জঘন্য পাপ বলে মনে করা হত।

অদ্বৈত আচার্য্য পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্টে জন্ম গ্রহণ করলেও তিনি শান্তিপুরেই বাস করতেন। তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে বয়সে পাণ্ডিত্যে শাস্ত্রজ্ঞানে—সকলের সম্মানের পাত্র ছিলেন।

পরমার্থবিচারে অদ্বৈতাচার্য্য মহাবিষ্ণুর অবতার হিসাবে গণ্য। যে মহাবিষ্ণু মায়াশ্রিত হয়ে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, অদ্বৈত তাঁরই অবতার। এই অদ্বৈতাচার্য্যই কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিত্য গঙ্গা জল তুলসী দিয়ে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং তাঁরই প্রার্থনায় শ্রীমন্মহাপ্রভু কৃপা করে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কলি যুগের পতিত জনকে কৃষ্ণনাম দিয়ে উদ্ধার করার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন অবশ্য তখন যুগাবতারের অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও হয়েছিল। তদুপরি অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনা অবতরণ কার্য্যকে ত্বরান্বিত করেছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতার

ঠিক যখন অবতরণের মুহূর্ত্ত উপস্থিত হল, অদ্বৈতাচার্য্য অন্তরে অনুভব করলেন "আমার প্রার্থনা পূরণ হয়েছে তিনি আসছেন তার পরে পরে তিনি শুনলেন যে, শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নবজাত শিশুরূপে তাঁর আরাধ্য দেবতা অবতীর্ণ হয়েছেন, নাম হয়েছে নিমাই বিশ্বম্ভর তখন অদ্বৈতাচার্য্য তাঁর দর্শন করার জন্য নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে এলেন।

যখন ঐ বালক একটু বড় হয়েছেন, তখন তিনি এসে ঐ বালককে প্রণাম করলেন। ঐ দেখে শচীদেবী ভয়ে কাতর হয়ে পড়লেন আপনি একি করেন ? আপনি একজন প্রবীণ বয়সের মহাপণ্ডিত। আপনি যদি ছোট বালককে প্রণাম করেন, তবে ভবিষ্যতে তার অকল্যাণ হবে। তবুও অদ্বৈত যখনই আসতেন ঐ বালককে প্রণিপাত করতেন।

অন্য যেকোন লোক অদ্বৈতকে প্রণামে ধ্বংস হয়ে যেত; কিন্তু নিমাইর বেলায় তা ত' হল না। অধিকন্তু তিনি প্রণাম করামাত্রে নিমাই তাঁর মাথার উপর নিজের একটা পা রেখে দিতেন। ঐ দৃশ্য দেখে সকলে স্তব্ধ হয়ে যেত, মনে করত এই বালকের কি অদ্ভুত ঐশ্বরিক শক্তি আছে। অদ্বৈতের মত এতবড় ভক্ত, বিদ্বান্ পণ্ডিতের মাথায় পা তুলে দিচ্ছে এই ছোট্ট একটা বালক অথচ তার কিছুই হচ্ছে না? কে এ বালক!

নিমাইর বাল্যকাল

ছোট বেলায় নিমাই মাঝে মাঝে একটা কম্বলে সারাটা গায়ে মুড়ি দিয়ে কোন প্রতিবেশীর কলাবগানে ঢুকে পড়তেন এবং মাথা দিয়ে কলাগাছগুলো ভেঙ্গে ফেলতেন। বাড়ীর লোক মনে করত যে কোন ষাঁড় এসে কলাগাছ গুলো ভেঙ্গে ফেলেছে। এই রকম খেলার ছলে নিজের ভক্তগণের শিক্ষা দিতেন, আমি যে তোমাদের কলাগাছগুলো ভেঙ্গেছি, তাতে আমার সেবায় লাগবে অন্যভাবে। তার অর্থ হল—তোমরা আমার নিত্য সেবক। তাই আমি আমার খুশি মত যা-ইচ্ছে তাই করব।

কখন কখনও শ্রীধর পণ্ডিতের হাত থেকে কলা কেড়ে নিয়ে বলতেন, "এ কলা আমাকে দাও, আমি তোমায় কোন দামই দেবো না। শ্রীধর তখন বলত, "কেন তুমি ওরকম করছ, তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, আমি তোমায় বারণ করি বা কি করে? আমি অতি গরীব, তোমার এমন করা সাজে না। তুমি যদি এ রকম কেড়ে নাও তবে আমি কি করে বাঁচবো?"

নিমাই যখন বড় হলেন, তিনি অদ্বৈতাচার্য্যকে খুব সম্মান দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য তাতে অসহ্য বোধ করে বলতেন, তুমি সাধারণ মানুষ নও। তুমি ত' প্রকৃতির অতীত পরমপরাৎপর স্বয়ং ভগবান। তুমি বয়সে আমার চেয়ে ছোট বলেই আমায় সম্মান করছ। কিন্তু আমি কি করে তা সহ্য করি, আমার প্রতি এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? নিমাই বরাবর ঐ রকম মর্য্যাদাপূর্ণ ব্যবহার দেখাতেন। যখনই দেখা হত ঐ একই কথা!

অদ্বৈত ওটা বন্ধ করতে একটা বুদ্ধি খাটালেন। শান্তিপুরে ফিরে গিয়ে যোগ-বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করে ভক্তি ভাবের নিন্দা করতে আরম্ভ করলেন এবং তা যেন নিমাই পণ্ডিতের কানে যায় সেই ভাবেতে প্রচার আরম্ভ করলেন। জ্ঞান সাধনা যে ভক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথা খুব জোর দিয়ে প্রচার করলেন। তাঁর যুক্তি হল, ভক্তিপথে ভগবান্‌কে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়, জ্ঞানের দ্বারাই ভগবানকে সাধক অনুভব করতে চায়, কিন্তু ভক্তি পথ বলে যে, ভগবান অধোক্ষজ, তাঁর কৃপা দ্বারাই তাঁকে জানা

যায়। জ্ঞানের পথে জানা যায় ভগবান ত' হৃদয়েই আছেন, তাই ভক্তিপথ অতি গৌণ।

বৃদ্ধ লোকটিকে মেরে ফেল না!

এই প্রকার ভক্তিবিরোধী ব্যাখ্যা মহাপ্রভুর কানে পৌঁছাল। তাই তিনি রেগে গিয়ে নিত্যানন্দকে সঙ্গে করে সোজা গিয়ে অদ্বৈতাচার্য্যকে শাস্তি দিতে শান্তিপুরে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়েই ডেকে বললেন—

"অদ্বৈত! তুমি কেন আমায় গঙ্গাজল তুলসী দিয়ে ডেকে ছিলে? আর এখন একি আরম্ভ করেছ? আমার সঙ্গে ঠাট্টা? ভক্তিপথের বিপক্ষে প্রচার করে আমার বিরোধেই লেগে পড়েছ? দাঁড়াও দেখছি তোমায়?

এই বলেই মহাপ্রভু অদ্বৈতকে চুল ধরে টেনে এনে ধুম কিল চড়! এই ব্যাপার দেখেই অদ্বৈত গৃহিনী সীতাদেবী কান্নাকাটি আরম্ভ করে আকুল হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, ওগো একি করছ বুড়োটাকে মেরে ফেল না। নিত্যানন্দ কিন্তু মজা দেখছিলেন, তিনি কেবল দাঁড়িয়েই হাঁসতে থাকলেন। হরিদাস ঠাকুর একটু দূরে দাঁড়িয়ে এ সব কাণ্ড দেখে হতভম্ব! একি লীলা আবার!

অদ্বৈতের আনন্দ দেখে কে? তিনি খুব খুশি, বললেন— "এবার তোমায় বেশ শাস্তি দিয়েছি আমিই জিতেছি। তুমি হেরে গেলে। তাই না? এই বলেই অদ্বৈত আনন্দে নাচতে আরম্ভ করলেন আবার বললেন, কোথায় গেল আমার পায়ে ধরে মাথায় তোলা ? ডেকে ছিলাম ঠিকই, তবে আমার পায়ে ধরা নয়— আমার মাথায় পা তুলে দেওয়ার জন্যই ডেকেছি।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত— "শাস্তি দিলাম? না শাস্তি পেলাম।"

এবার ভোজনের পালা। মহাপ্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন শাক— সবই প্রস্তুত। পিতামহের বয়স্ক তৎকালে নদীয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পূজ্য অদ্বৈতাচার্য্যকে কিল চড় মারা— একি কম সৌভাগ্য কম প্রীতি বন্ধন! তাই দেখিয়ে দিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু।

আমরা সাধারণতঃ পূজ্য ব্যক্তিকে সম্মান করি মর্য্যদা দেখাই; কিন্তু যাঁরা অতি অন্তরঙ্গ তাদের কাছে বয়স, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির কোন মূল্যই থাকে না।

ভক্তির জগতে ও তাই। ভক্ত নিজের প্রিয় ভগবানের কাছে শাস্তি পেলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে উল্লসিত হয়। তাই প্রিয়ের কাছ থেকে— ভগবানের কাছ থেকে শাস্তি পাওয়া অমর্য্যাদা পাওয়া কি কম সৌভাগ্য!

অদ্বৈতের রহস্য কবিতা

বহু বৎসর পরে, যখন মহাপ্রভুর কৃষ্ণ বিরহ উন্মাদ দশা শেষ হয়ে আসছিল, তখন অদ্বৈত জগদানন্দের হাতে একটী হেয়াঁলি কবিতা লিখে পাঠালেন। কবিতাটি এই প্রকার,—

বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।

অর্থাৎ "উন্মাদ অবস্থায় উপনীত প্রভুকে বলিও যে, সকলেই উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছে, হাটে আর চাল বিক্রী হয় না। কৃষ্ণপ্রেমে পাগল পারা মানুষ এখন নিজের সাংসারিক জীবনে উদাসীন। প্রভুকে বলিও একটা পাগলই তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন ঐ কবিতাটি পাঠ করলেন, তখন তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। স্বরূপ দামোদর জিজ্ঞাসা করলেন ওতে কি লেখা আছে।"

তার উত্তরেও মহাপ্রভু সেই রহস্যময় ভাষায় বললেন, "তার অর্থ আমিই বুঝতে পারছি না। তবে আচার্য্য ত' একজন মহান পূজারী একজন প্রবীণ পূজকই তার অর্থ হয়ত ধরতে পারে — তারা পূজার জন্য দেবতাকে আবাহন করে আবার পূজা শেষ হয়ে গেলে দেবতাকে বিসর্জন দেয়। হয়ত অদ্বৈত মনে করেছেন পূজা ত' শেষ হয়ে গেছে, এখন বিসর্জন দেওয়া হোক। তবে আমি এর কোন মর্মই ধরতে পারছিনা হয়ত তিনি তাই চাইছেন।"

স্বরূপ দামোদর নিজেই কবিতাটি পাঠ করলেন। এখন তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন, অদ্বৈত আচার্য্যই মহাপ্রভুকে জল তুলসী দিয়ে অবতরণের জন্য আবাহন করেছিলেন। এখন কৃষ্ণ নাম প্রেম বিতরণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন তাঁর আর কোন কাজই নাই, তিনি এখন স্বধামে ফিরে যেতে পারেন।

শেষ দ্বাদশ বৎসর

এর পর শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বার বৎসর শ্রীক্ষেত্রে প্রকট ছিলেন, কিন্তু তাঁর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ঐ দিন থেকে তাঁর কৃষ্ণ বিরহবেদনা— যা শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণের মথুরা গমনের পর হয়েছিল, সেই ভাবে একপ্রকার উন্মাদ

দশায় ছিলেন। অন্য কোন প্রকার জন সংসর্গ থেকে তিনি নিজেকে একেবারে সরিয়ে নিলেন। কেবল স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দই তাঁর ঐ বেদনা বিধুর অবস্থায় সহমর্মী ছিলেন। কৃষ্ণের মথুরাগমনের পর শ্রীমতী রাধারাণীর যে অবস্থা হয়েছিল, ঠিক সেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ জনিত প্রেমোন্মাদ অবস্থায় কাশীমিশ্রভবনের এক নিভৃত কোঠরীর মধ্যে তিনি বারবর্ষ কাটিয়ে ছিলেন।

একদিন গভীর রাত্রে তিনি বদ্ধদ্বার ও প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। স্বরূপ দামোদর রাত্রে গম্ভীরার মধ্যে কৃষ্ণ নামোচ্চারণ শব্দ শুনতে না পেয়ে কপাট খুলে দেখেন যে মহাপ্রভু সেখানে নাই।

গেলেন কোথায়? অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষে দেখাগেল তিনি শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে মূর্ছিত হয়ে শুয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর হাত-পা কূর্মের মত ভেতরে ঢুকে গিয়েছে, তাঁর শ্রীঅঙ্গের মধুর সুগন্ধে আকৃষ্ট হয়ে গাভীগণ তাঁর চারিদিকে আঘ্রাণ নিচ্ছে। স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি ভক্তগণ উচ্চস্বরে তাঁর কানের কাছে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করলে তাঁর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। তিনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে কেবল এদিক ও দিক্ তাকাতে লাগলেন পরে বলে উঠলেন, তোমরা কেন আমায় এখানে নিয়ে এলে? আমি বৃন্দাবনে দর্শন করছিলাম — কৃষ্ণ রাধারাণী ও অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে নৃত্যগীতাদি সহ মধুরলীলা করছেন, আমি তাই দেখে আনন্দে নিমগ্ন ছিলাম। তোমরা চিৎকার করে আমাকে এখানে টেনে এনেছ কেন? কেন বল দেখি?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ নামসংকীর্ত্তন প্রচার করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন, আর এখন যাঁরা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে তাঁর চেতনা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁরা কেউ সাধারণ মানুষ নন; তাঁরা তাঁরই অত্যন্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি। অথচ সেই কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করা কে সেই মহাপ্রভু বলছেন "চিৎকার", এ কি রকম কথা।

মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহবিচ্ছেদ দশদশায় মূর্চ্ছা অবস্থায় কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা দর্শনে মগ্ন; তখন 'কৃষ্ণ' শব্দ বা যে কোন শব্দ তাঁর সেই লীলাদর্শনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে এতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নাই। আমাদের কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কালে কতটুকুই বা কৃষ্ণলীলা স্মরণ হয়, যে সেই উচ্চারণ চিৎকার ছাড়া আর কি!

আর একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রের ধারে যেতে যেতে কেউ সুললিত স্বরে গীতগোবিন্দের পদ গান করছিল। শুনা মাত্রই তিনি সেই দিকে উন্মত্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করলেন। তাঁর পেছনে গোবিন্দও ছিলেন। গোবিন্দ দূর থেকে দেখতে পেলেন যে কোন দেবদাসীই গীত-গোবিন্দ গান করছে। মহাপ্রভু চটকপর্বতের কাঁটা গাছের

মধ্য দিয়ে ছুটেছেন, গায়ে কাঁটা আঁচড়ে রক্ত ঝরছে, তবুও তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। গোবিন্দ দৌড়ে গিয়ে প্রভুকে দু বাহুতে চেপে ধরে বললেন প্রভু ও যে দেবদাসী।

গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে মোর হইত মরণ।।

তখন ঐ প্রথা ছিল। সন্ন্যাসী যদি নারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, তবে তার একমাত্র প্রায়শ্চিত তুষানল। মহাপ্রভু আশ্বস্ত হয়ে বললেন গোবিন্দ! তুমি আজ আমাকে বাঁচালে।

কৃষ্ণ প্রেমে পাগল-প্রায়

আর একদিন মহাপ্রভুর সমুদ্রের নীলজল দেখেই তাঁর বৃন্দাবনের যমুনা-নদী এবং তাঁর তীরে কৃষ্ণ ও গোপীগণের বিচিত্র মধুরলীলা স্ফূর্ত্তি হল। দেখা মাত্রই তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন এবং ভেসে চললেন।

এদিকে মহাপ্রভুকে গম্ভীরার মধ্যে দেখতে না পেয়ে সকলেই স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে সমুদ্রের ধারে ধারে কোণার্কের দিকে এগিয়ে চললেন। যেতে যেতে দেখতে পেলেন, এক ধীবর কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলতে বলতে সকলকে বলল, আপনারা ওদিকে যাবেন না;একটা ভূত আছে। আমার জালে একটা মরা মানুষ পড়ল। আমি তার গা থেকে জাল খুলতেই তার ছোঁয়া লেগে গেল, আমি সেই সময় থেকে কেবল কৃষ্ণ, কৃষ্ণ বলছি, থামাতে পারছি না। ওটা ব্রহ্মদৈত্য হবে।

এসমস্ত শুনে স্বরূপ গোসাঞি ঘটনাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, আমি ভূতছাড়ার মন্ত্র জানি— এই বলে তার গালে একটা চাপড় মেরে বললেন চল। কোথায় সে আছে আমাদের নিয়ে চল।

কিছুদুর গিয়েই ভক্তগণ দেখতে পেলেন, এ স্বয়ং প্রভুই মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন। সকলেই উচ্চস্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করতেই মহাপ্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হল। মূর্চ্ছার সময় অস্বাভাবিকহাত পা গুলি পূর্ববৎ স্বাভাবিক হয়ে গেল। তার পর মহাপ্রভু যে সব কৃষ্ণলীলা দর্শন করছিলেন, সেই সব বর্ণনা করলেন।

অদ্বৈতাচার্য্যের ঐ রহস্য-কবিতা পড়ার পর থেকে বার বৎসর যাবৎ মহাপ্রভুর কৃষ্ণবিরহ দশা এই ভাবেই শেষ পর্য্যন্ত কেটেছিল।

প্রেমপাগল নিমাই পণ্ডিত

শ্রীক্ষেত্রে শেষ বার বৎসর মহাপ্রভুর এইভাবে কেটে ছিল। তার পূর্বে নবদ্বীপে ও তাঁর সেই অবস্থা মাঝে মাঝে দেখা যেত। নবদ্বীপে যখন তিনি কিশোর বা প্রথম যৌবন অবস্থায়ও একজন মহাপণ্ডিত বলে খ্যাতি লাভ করেছেন, ঐ বয়সে তিনি গয়ায় পিণ্ডদান করতে গিয়ে ঈশ্বরপুরীর নিকট কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করলেন। দেখাগেল তিনি পুরোপুরি আর একব্যক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছেন।

নবদ্বীপের জনসাধারণ ত' বটেই, বড় বড় বিদ্বান্ পণ্ডিতগণও নিমাই পণ্ডিতের ভাবগতিক, চালচলন দেখে তারা মনে করলেন, " এ কি হল? এত খুব ভাল লোক ছিল বেশ ভদ্র, বিনীত, নম্র, কিন্তু গয়া থেকে ফিরে এত কৃষ্ণভক্ত হয়ে গিয়েছে। কোন আচারই মানে না— কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ!"

আগে ত' এখুব ভাল ছেলে ছিল একজন বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ভারতবিখ্যাত কেশব- কাশ্মীরিকেও শাস্ত্র তর্কে পরাজিত করে দিয়েছে। কিন্তু এখন দেখছি, আমরা সে নিমাইকে হারিয়েছি। সে এখন অতি অস্বাভাবিক আচরণ দেখাচ্ছে! জাতিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকেও এমনকি শাস্ত্রও মানে না! একটা নতুন মত প্রচার করতে আরম্ভ করেছে কাউকেও খাতির করে না— এমন কি নিজের স্ত্রীকেও না। এ কি?

কিছু লোক সোজা গিয়ে শচীদেবীর কাছে আপত্তি-অভিযোগ আরম্ভ করল। আরও বলল, "তোমার ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছে। তুমি অতি ভদ্র পরিবারের কন্যা ও গৃহিণী তোমার আবার এ কি দুর্ভাগ্য? তোমার এত বিদ্বান একমাত্র ছেলে এখন ত' বদ্ধপাগল। ওর চিকিৎসা কর, বৈদ্য ডেকে কিছু একটা ব্যবস্থা কর।"

শচীদেবী বৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন—চিকিৎসার জন্য অনুরোধ করলেন। বৈদ্য এক অভিনব ব্যবস্থা দিলেন। ইট দিয়ে ছোট এক স্নানের চৌবাচ্চা করা হল। তাতে বিষ্ণুতেল ভরে দেওয়া হল। নিমাই তার মধ্যে ডুবে স্নান করবেন। নিমাই তার মধ্যে ঢুকে স্নান করেই হাঁসতে হাঁসতে খেলা করতে আরম্ভ করলেন। কখন ডুব দিলেন, কখন বা সাঁতার কাটলেন, কখন কখন পাগলের মত হাঁসতেই থাকলেন। এসব দেখে সাধারণ লোক ভুল বুঝল।

খবর পেয়ে শ্রীবাস পণ্ডিত এসে শচীদেবীকে মহাপ্রভু কেমন আছেন জানতে চাইলে শচীমাতা, সবই বললেন, বৈদ্যের ব্যবস্থা মত বিষ্ণু তৈলের চৌবাচ্চায় স্নান করার সংবাদও দিলেন। তবে বললেন, কবিরাজের এই চিকিৎসায় নিমাইর পাগলামী আরও বেড়ে গেছে। পাড়ার সবাই যা বলল, তাই ত' করলাম।

শ্রীবাস নিমাইকে দেখলেন। তারপর শচীমাতাকে বললেন, "আপনি খুব সরল, কার সঙ্গে কি ব্যবহার করা যায় তা আপনি জানেন না। নিমাইর যা হয়েছে, তা ত' আমি চাই। ওর পাগলামি নয়, ওযে কৃষ্ণপ্রেম। আমরা সকলে যদি আর কিছুদিন বাঁচি, তবে কৃষ্ণের অনেক মধুরলীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য পাব।"

শ্রীবাসের এই কথা শুনে নিমাই একেবারে শান্ত স্বাভাবিক হয়ে বললেন, "শ্রীবাস! তুমিও যদি সকলের মত আমায় 'পাগলামি করছি' বলতে, তবে আমি গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিতাম। যা হোক, তুমিই বুঝতে পেরেছ আমার আসলে কি হয়েছে।"

গয়া যাওয়ার পূর্বে নিমাই ছিলেন, নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিত। কিন্তু গয়া থেকে ফেরার পর কৃষ্ণভক্তিরসে নিমগ্ন নিমাই ব্যাকরণ পড়ান আরম্ভ করেই ব্যাকরণের সব সূত্রের কৃষ্ণ পর ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। ব্যাকরণের প্রত্যেক সূত্রে কৃষ্ণই উদ্দিষ্ট, এই তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রদের বুঝাতে চাইলেন। তিনি আরও বললেন, শব্দই ব্রহ্মময় আর সেই শব্দব্রহ্ম কৃষ্ণই। শব্দ শক্তি ত' কৃষ্ণের শক্তি;আর ঐ শক্তিই বিশ্বপ্রকৃতিকে গতিশীল করছে। সংসার চক্র অহরহ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। ঐ শক্তি থেকে বিচ্যুত হলে সবই জড়, মৃতবৎ— স্থানু হয়ে যাবে।

এইভাবে নিমাই পণ্ডিত সবশাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য যে কৃষ্ণই, এই সিদ্ধান্ত প্রচার করতে আরম্ভ করলেন।

এই প্রকার কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা শুনেই তাঁর ছাত্রগণ বিব্রত হয়ে গিয়ে আলোচনা করল, আমরা ব্যাকরণ কাব্যাদি সংস্কৃত জ্ঞান অর্জ্জন করতে এসেছি। এখন দেখছি নিমাই পণ্ডিতের কাছে আর তা পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তথাপি তাঁর কাছ থেকে যে রকম শিক্ষা পাই তা আর কোথাও কারো কাছ থেকে পাওয়া যাবে না। তাঁকে ছাড়াও চলবে না। এখন একটা উপায় করা যেতে পারে। ওঁর গুরু হচ্ছেন গঙ্গাদাস পণ্ডিত, তাই তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করা যে, তিনি যেন নিমাই পণ্ডিতকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলেন।

এই স্থির করে সকলে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হলেন। গঙ্গাদাস পণ্ডিত তাঁদের বুঝিয়ে বলেলন: "নিমাই ত' খুব ভাল লোক আর তিনি খুব বিদ্বান্। তোমরা তাঁর কাছেই সব পাবে।" ছাত্ররা বলল, "হাঁ মহাশয়! তিনি খুব ভাল লোক ও বিদ্বান্, কিন্তু গয়া থেকে আসার পরই তিনি কেবল সবসূত্র, সব শব্দই যে কৃষ্ণপর এই ব্যাখ্যাই করছেন। কৃষ্ণ ব্যতীত শব্দের আর কোন অর্থই তিনি বলছেন না। তাঁর দর্শন খুব উচ্চস্তরের, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাতে ত' আমাদের ব্যাকরণ অলঙ্কারাদি শিক্ষা হবে না, আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বললে তিনি আপনার কথা রাখবেন, কারণ তিনি আপনার শিষ্য।"

গঙ্গাদাস বললেন "আচ্ছা" তাঁকে বল গিয়ে সে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তখন ছাত্রগণ গিয়ে নিমাই পণ্ডিতকে বললেন:

"আপনার অধ্যাপক গুরু গঙ্গাদাস পণ্ডিত আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন"। নিমাই একথা শুনে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁকে ভক্তিভাবে প্রণাম করলেন।

গঙ্গাদাস নিমাইকে দেখে আদরের স্বরে আরম্ভ করলেন, "বাছা! সব ভল ত'? তুমি গয়ায় গিয়ে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করেছ শুনে খুব ভাল লাগল। এত তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসে তুমি ভাল পড়াশুনা করাচ্ছ না বলে তোমার ছাত্ররা আমাকে বলেছে। এ কি সত্যি? কেন তুমি ঠিকভাবে পড়াচ্ছ না? আগে যেমন পড়াতে, তা না করে কিসব নূতন ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছ! শুনেছি তুমি ভক্ত হয়ে গেছ তা ত ভালকথা, কিন্তু ছাত্ররা কেন অসন্তুষ্ট হচ্ছে? আর এমন করো না। তোমার পূর্বপুরুষেরাও ভক্ত ছিল। তুমি এ কি অদ্ভুত প্রকার ভক্ত হয়েছ। তুমি যে ভাবে ভক্তির ব্যাখ্যা করছ, তা ত ঠিকনয়। যাক্, আর ওসব করোনা। এই মনে ভেবে নিও না যে তোমার পূর্বগুরুবর্গরা বোকা ছিল। কি তোমার বলার আছে?"

নিমাই গুরুর পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কেবল আসবার সময় বলে এলেন "আপনার আদেশ পালন করার চেষ্টা করব। আপনার পদধূলির করুণায় এমন কেউ নাই যে আমায় পাণ্ডিত্যে পরাজিত করে? তাদের আমি উচিত শিক্ষাই দিব।"

আর কৃষ্ণের নামে কাজ নাই

কয়েক দিনের পরেই নিমাই ভাবাবিষ্ট হয়ে রাস্তায় যেতে যেতে কেবল গোপী, গোপী জপ করতে আরম্ভ করলেন। তখন নবদ্বীপের কিছু গণ্যমান্য পণ্ডিত তাঁর কাছে গিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন,

"নিমাই পণ্ডিত! তুমি একজন নামকরা পণ্ডিত এবং এখন ভক্ত হয়েছ। তাতে কোন কথা নাই। কিন্তু এখন গোপী, গোপী জপ করে বেড়াচ্ছ কেন? কৃষ্ণনাম জপ কর। শাস্ত্রে বলে কৃষ্ণনাম জপ করলেই মঙ্গল হবে। এসব জেনেও তুমি এখন গোপী গোপী জপ করছ কেন? এতে তোমার কি মঙ্গল হবে! দেখছি তুমি ত' একটা পাগল!"

এসব শুনে নিমাই বলে উঠলেন, "কে ও কৃষ্ণ, আমি তার নাম জপ করব কেন? সে ত' একটা ডাকাত লম্পট"— এই বলেই তিনি একটা লাঠি নিয়েই ওদের তাড়া করলেন।

এর পরই ওদের সকলকে নিয়ে একটা আলোচনা সভা বসল— "নিমাই এখন

বদ্ধপাগল হয়ে গিয়েছে। আমরা ত' যা তা লোক নই। সমাজে আমাদের মান মর্য্যাদা আছে। তাঁকে কিছু ভাল কথা বলতে গেলাম; অমনি ইতর লোকের মত লাঠি নিয়ে তাড়া করল। আমরাও দেখে নেব!"

সকলে মিলে ঠিক করল নিমাইকে আচ্ছা করে পিটিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে নিমাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন

করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ নিবারিতে।

উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে।।

— এ কি হল, আমি এলাম এদের ত্রাণ করতে। এই হতভাগ্য কলি জীবকে ত্রাণ করে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু দান করার জন্য অবতীর্ণ হলাম। অথচ দেখছি — এরা আমার নিন্দা করে আরও পাপপঙ্কে তলিয়ে যাচ্ছে। আমাকেই শাস্তি দেওয়ার চক্রান্ত করছে! কেন তা হলে অবতার? কি করলে এদের উদ্ধার হয়? তবে একটি মাত্র উপায় আছে। আমাকে ওরা তাদের মতই গৃহস্থ সংসারী মনে করে এই রকম অবজ্ঞা করছে! আমি তা হলে সন্ন্যাস নেব! কিছু না হলে সন্ন্যাস বলেই তারা গৃহস্থের কর্ত্তব্য হিসাবে আমাকে দেখলেই মাথা নত করে প্রণাম করবে। এইটুকু মর্য্যাদা আমাকে তারা দিতে বাধ্য হবে— এইটুকুই উপলক্ষ্য করে তাদের কিছুটা মঙ্গল হতে পারবে।

সন্ন্যাস আমাকে নিতেই হবে। দিনও ঠিক করে ফেললেন।একথা কেবল নিত্যানন্দ প্রভু এবং তার ২/১ জনকেই তিনি জানিয়ে ছিলেন।

দারুণ বিচ্ছেদ

সৌরমাস গণনায় ঐ দিনটি ছিল মকর-সংক্রান্তি, সূর্য্যের উত্তরায়ণের প্রথম দিন। এই শুভদিনেই মহাপ্রভু কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। তারপর থেকে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নামেই বিখ্যাত হোলেন। তিনি গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে পার হয়ে কাটোয়ায় পৌঁছালেন।

ঠিক তার পূর্বে নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি মাত্র কয়েকজনকে তিনি একথা প্রকাশ করে বলেছিলেন— "আমার সন্ন্যাস নেওয়ার দিন আগত প্রায়"।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্বে নবদ্বীপে নিমাইর একটা বিরোধীদলের আভাস পাওয়া গেল। তারা ছিল মুখ্যত অত্যন্ত জড়ভোগবাদী আধ্যাত্মিকতার কোন উপাদানই তাদের ছিল না। তারাই বেশীকরে নিমাই পণ্ডিতের প্রকাশ্য নিন্দা আরম্ভ করে দিল।

তখন নিমাই চিন্তিত হয়ে পড়লেন, "আমি ত' সবচেয়ে নিম্নস্তরের পতিতগণকে উদ্ধার করতে এসেছি। এখন দেখছি তারা আমার নিন্দা করে আরও বেশী অধঃপাতে নেমে যাবে। আমি কলিযুগের একমাত্র পরিত্রাণের উপায় কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করতে অবতীর্ণ হলাম। কিন্তু এখন দেখছি রোগ ত' দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে, চিকিৎসার বাহিরে চলে যাচ্ছে। রোগীরাই চিকিৎসকের বিরোধী হতে চলেছে। তারা ভেবে নিয়েছে, আমি আর এমন কে, তাদেরই ভাই-বন্ধু, মাসী-পিসীর ছেলে।

তাই আমাকে অন্তত দেখাতে হবে আমি তাদের মত কেউ নই, তাদের মত সংসারাসক্ত নই। আমি সন্ন্যাস নেব, গ্রামে, গ্রামে, শহরে নগরে ঘুরে বেড়িয়ে কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন করব।"

এই তাঁর নিশ্চিত সিদ্ধান্ত — দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি কাটোয়ায় গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করার জন্য ঘরদ্বার, নবদ্বীপ ছেড়ে চললেন চিরদিনের মত।

ঠিক গৃহত্যাগের আগের দিন অপরাহ্ন থেকে নিমাই পণ্ডিতের ঘরে দলে দলে তাঁর অনুরাগী লোকজন আসতে আরম্ভ করল। ঐ দিনটি ছিল লক্ষ্মীপূজার তিথি। ঐ তিথিতে নানাপ্রকার সুস্বাদু পিঠা তৈরী হয় লক্ষ্মীপ্রতিমার নিকট ভোগ দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঘটনাচক্রে নিমাই পণ্ডিতের সব প্রিয় ভক্তগণ সেইদিন তাঁর দর্শনের জন্য এসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

ভক্তগণ ফুলের মালা ও অন্যান্য উপহার হাতে নিয়ে তাঁদের উপাস্য মহাপ্রভুকে নিবেদন করলেন। কিন্তু কেবল চারজনমাত্র জেনেছিলেন। যে, মহাপ্রভু সেই রাত্রেই গৃহত্যাগ করে কাটোয়ায় রওনা হবেন। কিন্তু অন্য ভক্তগণ তা ত' জানতই না। প্রভু কিন্তু খুব আদর করে সকলকে মালা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন,

তোমরা নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করবে। কোন অবস্থাতেই কৃষ্ণনাম ছাড়বে না। দিন-রাত, খাওয়া-শোয়া, চলা-ফেরা সর্বদা সর্ব অবস্থায় কেবল কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করবে। আমার প্রতি তোমাদের যদি একটুও স্নেহ থাকে, তবে কৃষ্ণনামকীর্ত্তন ব্যতীত আর কোন কিছুই করবে না। কৃষ্ণই আমাদের পিতা-মাতা-সবই। পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ না হলে জন্ম-মরণ-জ্বালা থেকে মুক্তি নাই। তাই এই নামই নিরন্তর জপ কর—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

আর কোন ব্রত-অনুষ্ঠান দেব-দেবী পূজা কিছু দরকার নাই। এই মন্ত্র সামান্য মন্ত্র নয়— ইহা মহামন্ত্র— সব মন্ত্রের সার। আর কোন বিধি নাই।

প্রভু কহে কহিলাম— এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ।।

ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।

সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।।

এই জন্ম নিয়েছ, এত তোমার নিজের ঘর নয়;এত বিদেশ। তোমার নিজের ঘর ত' সেই কৃষ্ণের পাদপদ্ম সেইখানে ফিরে যেতে হবে, নিজের ঘরে ফিরতে হবে।

মহাপ্রভু এইভাবে আবেগভরা উপদেশ দিলেন। ভক্তগণ যেন কোন অদৃশ্য প্রেরণায় সেই সন্ধ্যায় তাদের প্রভুকে শেষবারের জন্য দর্শন করতে এসেছিলেন। নিমাইর এই ত' ছিল নবদ্বীপে শেষরাত্রি।

মহাপ্রভু ও খোলাবেচা শ্রীধর

অনেক রাত্রে প্রভুর একজন ভক্ত খোলাবেচা শ্রীধর এসে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। শ্রীধর অতি দরিদ্র; কাঁচকলা, কলাগাছের খোলা, কলাপাতা, মোচা ইত্যাদি নবদ্বীপ বাজারে এনে বিক্রী করত। মহাপ্রভু দৈনিক তাঁর কাছ থেকে কিছু নিতেন,

কিন্তু দাম দেবার বেলায় খুব দরদস্তুর করতেন, শেষে খুব কম দাম দিয়ে অথবা বিনা পয়সায় কিছু জোর করে নিয়ে নিতেন।

সে রাত্রে সেই শ্রীধর একটা লাউ এনে প্রভুকে দিল। প্রভু চিন্তা করলেন— একে আমি কেবল হয়রানই করেছি— সে তাতেই সন্তুষ্ট আজ যখন লাউ এনেছে, শেষ বারের মত তার সে সেবা আমি নেবই। সেই সময় আর একজন কিছু দুধ এনে দিল। মহাপ্রভু শচীমাতাকে দুধ-লাউর লক্‌লকি করবার জন্য অনুরোধ করলেন। শচীমাতা দুধ, লাউ, চিনি, দিয়ে প্রভুর প্রিয় খাদ্য প্রস্তুত করলেন।

প্রায় রাত তিনটা নাগাৎ বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যখন নিদ্রিতা, শচীমাতা প্রভুর ভাবী বিচ্ছেদ চিন্তায় না শুয়ে দোরগোড়ায় বসে থেকেও স্থানু প্রায়, মহাপ্রভু তাঁকে প্রণাম করে বেরিয়ে গেলেন শচীমাতা অচেতন প্রায়, কিছুই বলতে পারলেন না।

মহাপ্রভু গঙ্গায় সাঁতার দিয়ে ভিজাকাপড়ে প্রায় সকাল ১০ টায় কাটোয়ায় পৌঁছে কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করার প্রার্থনা জানালেন।

শচীমাতার বিচ্ছেদ-দুঃখ

সকাল হওয়া মাত্রে ভক্তগণ নিমাইর ঘরে এসে দেখলেন, শচীদেবী দ্বারের কাছে প্রতিমার মত বসে আছেন। ভেতর বাহির সব দরজা খোলা রয়েছে। লোকজন কি ব্যাপার কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করতেই শচীমাতা বলে উঠলেন, "তোমাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম। তোমরা ত' নিমাইর ভক্ত, এ ঘরদোর সব তোমরা সামলাও, আমি যেখানে খুশী চলে যাব। এ ঘরে আর আমি ঢুকবো না।"

"আপনি চলে যাবেন? তবে এই যুবতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখবে কে? নিমাই ত' ছেড়ে পালিয়ে গেল, এই মাত্র চৌদ্দ বৎসরের বালিকা বধূকে রক্ষা করবে কে? ওর দায় দায়িত্ব আপনি এড়াবেন কি করে?"

নিমাই কি ভাবে ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন, সমবেত ভক্তগণ সবই শুনলেন। নিমাই যে নবদ্বীপের সকলকেই ছেড়ে কাটোয়ায় কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস নিতে চলে গিয়েছেন, আর তিনি নবদ্বীপে ফিরে আসবেন না— এ সংবাদ শুনেই সকলে দুঃখে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। নিমাই এত বড় পণ্ডিত, দেখতে অপূর্ব সুন্দর, এমন দয়ালু, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে সকলকে পাগল করে দিয়েছেন। মহাপাপী জগাই-মাধাই দু ভাইকে উদ্ধার করে তাদের অত্যাচার থেকে সকলকে রক্ষা করেছেন। নবদ্বীপের কাজী সংকীর্ত্তনকারীদের খোল ভেঙ্গে দিয়েছিল, তাকেও বশীভূত করেছেন।

নবদ্বীপে যত ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত এসেছিল, তাদের শাস্ত্রকে পরাজিত করে নবদ্বীপের সম্মান রেখেছেন।

তখন নবদ্বীপে ন্যায়, তন্ত্র ও স্মার্ত্ত শাস্ত্রে বহু প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। কাশ্মীরের পণ্ডিত সরস্বতীর বরপুত্র কেশবকাশ্মীরী নবদ্বীপের পণ্ডিত সভায় সকলকে নিজের শাস্ত্র পাণ্ডিত্যে ম্লান করতে এসেছিলেন। কিন্তু নিমাই তার তুলনায় এক বালক হয়েও তাকে পরাজিত করেছিলেন।

চিরদিনের মত নবদ্বীপ ত্যাগ

এহেন নিমাই পণ্ডিত চিরদিনের জন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করে গেলেন। নবদ্বীপের অধিবাসী কিন্তু তাঁকে স্ব-মর্য্যাদায় রাখতে পারলেন না— তাঁকে চিনতেও পারলেন না।

নিমাই যখন কাটোয়ায় পৌঁছে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের প্রার্থনা করলেন, কেশবভারতীর আশ্রম হঠাৎ একটা উজ্জ্বল জ্যোতির আভায় উদ্‌ভাসিত হতে দেখা গেল। ভারতী মহারাজ সেই আলোকের ভিতর দেখলেন, একজন সুদর্শন পুরুষ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তিনি দাঁড়িয়ে ভালকরে তাকিয়ে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে মনে মনে বলতে লাগলেন, ইনি ত' নবদ্বীপের সেই প্রখ্যাত নিমাই পণ্ডিত।

নিমাই মধুর বিনয় বাক্যে বললেন, আমি আপনার নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা নিতে চাই।

কিন্তু কেশবভারতী তাঁর প্রার্থনায় অসম্মত হয়ে বললেন, তোমার সৌন্দর্য্য ও ব্যাক্তিত্বে আমি অভিভূত হয়ে গেছি;কিন্তু তুমি ত' চব্বিশ বৎসর বয়সের এক যুবক তোমার মা তোমার স্ত্রী তোমার অভিভাবকদের দশা কি হবে, তা চিন্তা করেছ? তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করে আমি তোমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়ার সাহস করতে অক্ষম।

সেদিন ছিল মকরসংক্রান্তি। সেদিন অনেক লোক গঙ্গাস্নানাদি উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছেন। তাই নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল।

প্রেমের প্রতিক্রিয়া

সকলেই একবাক্যে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধে প্রতিবাদ জানালেন। এমন কি, কেউ কেউ কেশবভারতীকে তাগিদ করে বলে উঠলেন, না তোমাকে তা করতে দেব না। তাঁর পরিবার আছে মা আছেন; স্ত্রীও রয়েছেন। এ হতে পারে না। যদি তুমি এই সুন্দর যুবকটিকে সন্ন্যাস দাও, তবে তোমার আশ্রম ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলব।

কিন্তু নিমাই সন্ন্যাস নিতে জিদ করে বসে রইলেন। শেষে কেশবভারতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, — তুমি কি সেই নিমাই পণ্ডিত— যার সম্পর্কে আমরা এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছি। নবদ্বীপ ত' বিদ্যার অবধি ওখানে কত ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত এসেছে আর তোমার মত বালকের কাছে হার মেনেছে— তুমি না সেই নিমাই ?

হাঁ প্রভু ! আমি সেই নিমাই— কেশব ভারতী বললেন তা হলে আমি তোমায় সন্ন্যাস দিতে পারি;তবে একটা শর্ত্তে, তুমি গিয়ে তোমার মায়ের অনুমতি নিয়ে এস: তা না হলে আমি পারবনা, কিছুতেই না।

নিমাই তৎক্ষনাৎ দৌড় দিলেন নবদ্বীপের দিকে—মায়ের অনুমতি আনতে।

কেশবভারতী এ দেখে ভাবলেন, আরে এত সবই পারে, একে কে ঠেকায় ?

কেশবভারতী পেছন থেকে ডাক দিলেন— ফিরে এস। তুমি ত' দেখছি অসাধারণ ছেলে! তুমি সবই পার। তুমি ঠিকই গিয়ে সকলকে— তোমার অভিভাবকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে বশ করে নিয়ে তাদের অনুমতি আদায় করে নিতে পারবে— তুমি সবই পার ! আবার ফিরে আসবে। তবু তোমার কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

এ কথা যেই শুনা, লোকজন ক্ষেপে গিয়ে চিৎকার করে বলল—

স্বামিজী ! এই সুন্দর ছেলেটিকে ঘরছাড়া করতে দেব না আমরা ! এটা অসম্ভব ! আপনার আশ্রম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব।

মহাপ্রভু অমোঘ অস্ত্র ধরলেন জনসমুদ্রকে শান্ত করতে। দু'হাত তুলে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করতে করতে পাগলের মত নাচতে লাগলেন।

এই প্রকার নৃত্যকীর্ত্তন সারাদিন সারারাত চলতে থাকল। পরদিন সকালে নিমাইর ইচ্ছাই কায়েম রইল। তথাপিও কিছু মতপার্থক্য রয়েই গেল।

লক্ষলোকের অশ্রু সজল কারুণ্য

নিত্যানন্দ প্রভু, নিমাইর মামা চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ দত্ত, জগদানন্দ পণ্ডিত একে একে এসে পৌঁছালেন। বিকালের দিকে সন্ন্যাস কর্ম আরম্ভ হল। নিমাই এর হয়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্য আনুষ্ঠানিক কর্ম-বিধি সম্পন্ন করলেন। নিমাই-এর নৃত্য কীর্ত্তন সকলকে মুগ্ধ করে দিল।

লক্ষলোচনাশ্রু-বর্ষ-হর্ষ-কেশ-কর্ত্তনং
কোটিকন্ঠ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাঢ্য-দণ্ড ধারণম্।
ন্যাসিবেশ সর্বদেশ হাহুতাশ কাতরং
প্রেমধাম দেবমেব নৌমি গৌরসুন্দরম্।।

"লক্ষলোকের অশ্রুবর্ষণের মধ্যে নিমাইর সুন্দর কেশরাশি শোভিত মস্তক মুণ্ডিত হল। কোটি কণ্ঠের সংকীর্ত্তন ধ্বনির মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারী নিমাইর হস্তে সন্ন্যাসদণ্ড শোভিত হল। সেই দৃশ্য যেখানে যে কোন ব্যক্তির চোখে পড়ল, সেও শোকে অধীর হয়ে গেল, সেই প্রেমদাতা সোনার গৌরাঙ্গের জয় হোক।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস - লীলা

আজ থেকে প্রায় পাঁচশত চৌদ্দ বর্ষ পূর্বের এক অভূতপূর্ব বিচিত্র প্রিয়বিচ্ছেদ বেদনার করুণ দৃশ্য। ঘটনার পুণ্যভূমি হল কাটোয়ার কেশবভারতীর আশ্রম-প্রাঙ্গন। এক অপূর্ব কমনীয় সুন্দর-সুঠাম যুবক, বয়স মাত্র চব্বিশ; মাথার কুঞ্চিত ঘননীল কেশরাশির কুটিল কুন্তলগুলি সেই যুবকের শ্রীমুখ কমলের মধুসৌরভে আকৃষ্ট ভ্রমরপুঞ্জের শোভা ধারণ করেছে।

নাপিতকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে সেই মস্তক মুণ্ডনের জন্য নাপিত খুর হাতে এগিয়ে গিয়েই থমকে গেছে— শোকে দুঃখে সে অশ্রু ঝরাচ্ছে—এমন সুন্দর মাথায় এমন সুন্দর কেশরাশিকে সে চাঁছবে কি করে?

দর্শকেরাও শোকে কেঁদে আকুল কি সাংঘাতিক কঠোর দয়াহীন ব্যাপার এখানে হতে চলেছে, তারা চিৎকার করছে—এমন কঠোর সন্ন্যাস-ব্যবস্থা কোন শাস্ত্র দিয়েছে— যাতে ঘর-দোর, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবকে-ছেড়ে দিয়ে এমন সুন্দর যুবক দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবে! এইটা কি রকম ধর্ম-ব্যবস্থা, এতে কি যুক্তিই আছে? এত নির্দ্দয়তা আবার ধর্মের নামে? হা ধিক্!

নিমাই যে এত জন অসন্তোষের মূল কেন্দ্র, যার জন্যই এত কোলাহল, তাঁর সুরঙ্গ অধরে কিন্তু মৃদু-মন্দ হাস্য রেখা! অতি ধীর কোমল কণ্ঠে তিনি নাপিতকে বারবার অনুরোধ করছেন মস্তক মুণ্ডনের জন্য। নাপিত শত অনিচ্ছা সত্ত্বে অশ্রু-সজল নেত্রে ক্ষুর চালিয়ে এমন সুন্দর কেশরাশিকেও ঐ সুন্দর মাথা থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হল।

সমবেত জন-সমুদ্রের আকুল অবেদন, ভীতি প্রদর্শন— সবই বৃথা হল। নিমাইর সন্ন্যাস গ্রহণের মুখ্য কর্ম মস্তক মুণ্ডন আরম্ভ হল।

নিমাই হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়লেন, মাত্র অর্দ্ধেক মুণ্ডন হয়েছে;কিছুক্ষণ পরেই নিমাই উঠে দাঁড়িয়ে কীর্ত্তন করতে করতে নাচতে আরম্ভ করলেন নাপিত থেমে গেল, একটু পরে কোন প্রকারে মুণ্ডন কর্ম শেষ হল।

নাপিত তার পরেই প্রতিজ্ঞা করল এই হাতে আর কাউকে ক্ষৌর করবে না, বরং ভিক্ষা করে খাবে। শেষ জীবন পর্যন্ত সে নাপিতের বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে মিষ্টি তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করল।

শেষে নিমাইর অনুরোধে মধ্যাহ্নের একটু পূর্ব থেকেই সন্ন্যাস-কর্ম আরম্ভ হল। নিমাই-এর মামা চন্দ্রশেখর আচার্য্য অনুষ্ঠানের মুখ্য পুরোধা হয়ে কাজ করলেন। সন্ন্যাস মন্ত্র গ্রহণের পূর্বেই মহাপ্রভু কেশবভারতীর কর্ণে মন্ত্রটি শুনিয়ে বললেন, "আপনি আমাকে এই মন্ত্রই ত' দিবেন? আমি এ মন্ত্র স্বপ্নে পেয়েছিলাম।" কেশবভারতী "হাঁ! ঐ মন্ত্রই দিব।" এই বলে সেই মন্ত্রই মহাপ্রভুকে দিলেন।

কিন্তু মহাপ্রভুর সন্ন্যাস নাম কেশব ভারতীর সাম্প্রদায়িক নাম না হয়ে তার মুখ থেকে এক অদ্ভুত "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য" নাম প্রকাশিত হল। আচার্য্য শঙ্করের দশনামী সন্ন্যাসীর সরস্বতী, গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি কোন নামই না হয়ে নিমাইএর নাম হল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। তখন সমবেত জনমণ্ডলী "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকি জয়" বলে জয়গান করে নৃত্যকীর্ত্তন করতে লাগলেন।

গৈরিক বস্ত্র শোভিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর সন্ন্যাস গুরু কেশবভারতী উভয়ে পরস্পরকে করে ধরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতে করতে নৃত্য করতে আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষণ পরে কেশবভারতী মহাপ্রভুর নূতন নামের অর্থ শুনিয়ে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অর্থ তিনি সমগ্র জগতে কৃষ্ণচেতনা জাগ্রত করাবেন। তিনি জগৎবাসীকে কৃষ্ণচৈতন্যময় করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তাঁর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অন্য কোন নামই হতে পারে না।

অমৃতময় জগৎ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে ঐ নামে প্রীত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, সত্যিইত আমি জগতের জীবকে তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা থেকে রক্ষা করে কৃষ্ণপ্রেম দিতে যাচ্ছি। আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, আমি সমগ্র বিশ্বকে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করে তাদের অমৃতসিন্ধুতে অভিস্নাত করাব। এখন সেই দায়িত্ব আমি গ্রহণ করতে চলেছি।

তিনি খুব প্রসন্ন ছিলেন;অপর পক্ষে তাঁর সন্ন্যাসীবেশ দেখে সমগ্র জনতা দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

আপাত দৃষ্টিতে মহাপ্রভু একজন নির্বিশেষবাদী মায়াবাদী সন্ন্যাসী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। প্রকৃতপক্ষে মহাপ্রভু কোন মায়াবাদীর কাছে সন্ন্যাস নিতে পারেন না।

মহাপ্রভু দিব্যদ্রষ্টা;তিনি কেশবভারতীর প্রকৃত স্বরূপ জানতেন। ভক্তগণও সন্ন্যাস নিলে কেবল আশ্রম-চিহ্নের জন্য পুরী, গিরি, ভারতী প্রভৃতি দশনামী সন্ন্যাসীর কোন একজনের নিকট নিতেন। যেমন মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, পরমানন্দ পুরী ইত্যাদি। আর মহাপ্রভুর দর্শন মাত্রেই জড়ও চেতন হয়ে যায়, কেশবভারতী মহাপ্রভুর দর্শনেই শুদ্ধভক্তে রূপান্তরিত হওয়া সাধারণ ঘটনা।

কৃষ্ণচেতনা-বিচ্ছেদে মিলন

নিমাই পণ্ডিতের সন্ন্যাস এইভাবে শেষ হল। তাঁর সন্ন্যাসের মর্মার্থ কি? এই সন্ন্যাস কি একটা অনাবশ্যক নিরর্থক লোকদেখান বেশভূষা মাত্র! অথবা এটা কি পরমার্থ কোন সহায়ক বা আবশ্যকতা মাত্র! এটা যদিও আপাতত অবাঞ্ছনীয় মনে হতে পারে, তবুও এর আবশ্যকতা আছে।

কৃষ্ণপ্রেমের নিভৃত ঘনীভূত স্তরে পরমপ্রিয়ের সঙ্গে মিলন ও বিচ্ছেদের একটী মুধুর সামঞ্জস্য রয়েছে। বিচ্ছেদ না হলে মিলনের সান্দ্রতা উপলব্ধ হয় না। মিলন সুখানুভূতির চেয়ে বিচ্ছেদ বেদনার তীব্রতা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারে। অভাববোধ যত তীব্র হয়, প্রিয়কে পাওয়ার তৃপ্তিও তত হয়।এতাদৃশ ভাব দিব্য প্রেমের স্তরেই সম্ভব অন্যত্র নয়।

সাধারণ জীবনেও দেখা যায়, একগ্লাস জল অতি সামান্য, কিন্তু সময় বিশেষে সেই একগ্লাস জলের জন্য জীব বেঁচে যায়, আর না পেলে জীবন শেষ হয়ে যায়। অভাববোধই প্রেমের গাঢ়তা বৃদ্ধি করে। পাওয়ার চেয়ে না পাওয়ার মধ্যেই প্রিয়ের সঙ্গে মিলন— একাত্মতা অতি নিবিড় হয়।

বৃন্দাবনে গোপীগণের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেমলীলা মাত্র পাঁচ বৎসর, সাত বৎসর বয়স থেকে বারো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত। তার পরেই তিনি মথুরায় চলে গেলেন। তবে পদ্মপুরাণের কৃষ্ণের বয়স গণনা রীতির অনুসরণে তাঁর এক বর্ষ বয়সের সঙ্গে দেড়বর্ষ যোগ করতে হবে। তা হলে আমরা যখন বলি কৃষ্ণের বয়স আট বৎসর, তাকে বারো এবং বারোকে আঠারো বুঝতে হবে। তার কারণ কৃষ্ণের বয়োবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমান নয়। তাই কৃষ্ণের বৃন্দাবনে ব্রজগোপী প্রেম তার পরেই কৃষ্ণ মথুরায় গেলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তা

কৃষ্ণ মথুরা অপেক্ষা দ্বারকায়ই বেশীরভাগ সময় কাটিয়েছেন। মোট একশত পঁচিশ বৎসর তিনি এই ধরাধামে লীলা প্রকট করেছেন।

তিনি বারো (মতান্তরে আঠারো) বৎসর বয়সে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় আসেন। তদবধি গোপীগণ সারাজীবনই কৃষ্ণবিচ্ছেদ বেদনায় অধীরা হয়ে কাটিয়েছেন। এত দীর্ঘকাল, আর এত কঠোর নির্ম্মম পরীক্ষা কোন কৃষ্ণপ্রেমপিয়াসীকে সহ্য করতে হয় নাই— এর নমুনা ইহজগৎ পরজগৎ কোন জগতেই সম্ভব নয়। কিন্তু এত কঠিন পরীক্ষায়ও ব্রজগোপীপ্রেম অনন্য, বৈকুণ্ঠেও দুর্ল্লভ। এ প্রেম ত' কমেই না, এর সান্দ্রতা কখনও হ্রাস হয় না, বরং কেবল বাড়তেই থাকে।

আর বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ, উভয় ধামেই পৃষ্ঠপট একপ্রকার। নবদ্বীপে মহাপ্রভু প্রতিপক্ষকে পরাজিত করার জন্য গৃহ-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। আর বৃন্দাবনেও সেই ব্যাপার। বৃন্দাবনের উপর বিদ্রোহীর অত্যাচার মথুরা থেকেই পূতনা, অঘ, বক, তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতিরূপে কংসরাজার দিক্ থেকে আসছিল। তার মূলোৎপাটন অর্থাৎ কংসকে নিপাত করার জন্য কৃষ্ণকে মথুরা আসতে হল। কিন্তু কংসবধের পর বিরোধ আরও তীব্র হয়ে উঠল। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ, তাঁর সহযোগী কালযবন, শিশুপাল, দন্তবক্র এবং আরও অনেকে কৃষ্ণের বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তাই কৃষ্ণ গোপীগণকে বলেছিলেন যে তিনি সব শত্রুকে নিপাত করার পর বৃন্দাবনে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে সুখে লীলাবিলাস করবেন। কিন্তু কুরুক্ষেত্রে যখন সাক্ষাৎ হল তখন তিনি বললেন, "আরও কিছু শত্রু রয়েছে ওদের শেষ করে আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।"

নবদ্বীপেও সেই পরিস্থিতি হল। মহাপ্রভু অন্যান্য ধর্ম্মমতবাদীগণকে পরাজিত করে পাঁচ বৎসর পরে যখন নবদ্বীপে ফিরে এলেন, তখন সকলেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পাগল প্রায় তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। তারা এত অধীর হয়ে পড়েছিল, তার বর্ণনা ভাষায় করা কঠিন।

গঙ্গানদীতে কেবল নর মুণ্ডমালা

তখন মহাপ্রভু নবদ্বীপে না গিয়ে লুকিয়ে চলে এসে নবদ্বীপের পরপারে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা) গৃহে রাত্রিবাস করেছিলেন। বৃন্দাবনযাত্রার জন্য মহাপ্রভু বাহিরে এসে কৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করতে করতে চললেন। গঙ্গার উভয় পারে, গঙ্গার মধ্যে কেবল নরমুণ্ড, জল আর দেখা যায় না। এমন কি রাস্তায় লোকজন মহাপ্রভুর পদধূলি নিতে রাস্তাও গর্ত্ত হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় আঠারো বৎসর পর্যন্ত মহাপ্রভু নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাতি লাভ করে, তারপর প্রায় ছয় বৎসর সমগ্র ভারতে বৃন্দাবন অবধি পরিভ্রমণ করেছিলেন।

তাঁর প্রকট কালের শেষ আঠারো বৎসর তিনি পুরী শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কাটিয়েছেন। তার মধ্যে ছয় বৎসর তিনি জনসাধারণের সংস্পর্শে কাটিয়ে শেষ বারো বৎসর জনস্পর্ক থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে রাধাগোবিন্দের বিচ্ছেদ বেদনার মধ্যে মিলন মাধুর্য্য আস্বাদনে নিমগ্ন ছিলেন।

অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রিয়বিরহের দশদশার অর্থাৎ স্তম্ভ-স্বেদ-রোমাঞ্চাদি থেকে শেষ দশা পর্য্যন্ত যত বিভাব-অনুভাব, সঞ্চারী-ব্যাভিচারী, প্রভৃতি লক্ষণ রয়েছে, সে সমস্ত ছাড়িয়ে অভূতপূর্ব যে সমস্ত বিকার তাঁর মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়েছিল, তা কোনও সিদ্ধভক্তের মধ্যেও দেখা যায় নাই। কেহ কখন শুনেও নাই।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতার — করুণার দুই ধারা

শ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য— দুই মুখ্য রহস্যের মধ্যে দ্বিবিধ প্রকাশ— বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য হল — কৃষ্ণনাম দিয়ে সংসারাবদ্ধ জীবের উদ্ধার এবং তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তির চরম প্রকাশ-বৃন্দাবনে সিদ্ধদেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় দাস-দাসী রূপে গোপীপ্রেমের মাধুর্য্যরসাস্বাদন। অর্থাৎ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যেমন তাঁর দিব্যনাম শব্দব্রহ্ম নাম প্রদান করলেন তেমনি দেখালেন শব্দব্রহ্ম নামের দ্বারা কিভাবে জীবের চরম-প্রাপ্তি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করা যায়।

অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্য কেবল নিজস্ব ব্যাপার, যা তিনি সব কলি যুগে করেন না; কেবল এক বিশেষ কলি যুগেই করে থাকেন।

ব্রহ্মার একদিনে বহু চতুর্যুগ ঘটে থাকে। কেবল কোন এক বিশেষ চতুর্যুগের বিশেষ কলি যুগে কৃষ্ণ নিত্যগোলোক বৃন্দাবন ও নিত্যপার্ষদসহ অবতীর্ণ হয়ে প্রেমরস আস্বাদন করেন। সেই দ্বাপর পরের কলিযুগে রাধারাণীর ভাব ও কান্তিধারণ করে, স্বমাধুর্য্য স্বরূপ, সেই মাধুর্য্য-আস্বাদনে শ্রীরাধারাণী সুখ এবং শ্রীমতীর প্রেমের পরাকাষ্ঠা কি প্রকার— তার আস্বাদন পাওয়ার লোভে শ্রীচৈতন্য রূপে কৃষ্ণ নিজেই অবতার গ্রহণ করেন। এতদ্ ব্যতীত সেই প্রণয়-মাধুর্য্য আপামর জনসাধারণকে আস্বাদন করানোর যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাপূর্ত্তিও আর এক মহান উদ্দেশ্য, তিনি সফল করে থাকেন। এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী একটি শ্লোকে প্রকাশ করেছেন:

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্‌ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-

ত্তদ্‌ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ।।

আর এই সমস্ত বাঞ্ছাপূর্ত্তির জন্যই কৃষ্ণ রাধারাণীর ভাব-কান্তি ধারণ করে দুই দেহকে একটি দেহে প্রকট করার জন্যই যে চৈতন্যাবতার তাও নিম্নশ্লোকে ব্যক্ত করেছেন :

রাধা কৃষ্ণ - প্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মাদ্

একাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।

চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্‌দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং

রাধাভাব-দ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্।।

শ্রীমতী রাধারাণী কেন কৃষ্ণের জন্য এত পাগল কৃষ্ণের মধ্যে এমন কি মাধুর্য্য আছে, যা শ্রীমতীকে এত পাগল করায়, কৃষ্ণ নিজেই তা জানতে চাইলেন আর কৃষ্ণ নিজে 'কৃষ্ণ' থেকে 'কৃষ্ণ' মাধুর্য্য কি করে জানবেন, তাই তাঁকে স্বয়ং শ্রীমতীর ভাব নিতেই হবে। তাঁকে শ্রীরাধার ভাব নিয়ে অবতীর্ণ হতেই হবে।

এক সময় কৃষ্ণ সেই ইচ্ছা শ্রীরাধারাণীর কাছে ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তা শুনেই রাধারাণী উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—

তা তুমি গিয়ে আমার জন্য ধুলোয় গড়াগড়ি দিবে;আর আমি তা কি করে সহ্য করব? তবে একটা কাজ আমি করতে পারি। আমিই তোমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থাকব, যাতে ঐ ধুলো তোমার অঙ্গে না লাগে। তোমাকে ধূলোয় গড়াগড়ি দিতে দেব না। আমি তোমার সর্বাঙ্গ আলিঙ্গন করে থাকব।

যে সিদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গের একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ, তাঁরাই এসব মর্ম জানেন। তাঁরাই রাধাভাব-কান্তি সম্মিলিত গৌরাঙ্গের ভজন করেন।

"রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণ-স্বরূপম্"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই অবতারে মাত্র ৪৮ বছর এই পৃথিবীতে প্রকটলীলা করেছিলেন। শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ নিত্যসিদ্ধ ব্রজলীলার শ্রীরাধারাণীর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সখী ললিতাদেবী। তিনিই শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যাবতীয় গোপনলীলার মুখ্যা সহচরী রূপে সবই অবগত হন। তাঁর অজানায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন লীলাই সম্ভব নয়।

তাই শ্রীল স্বরূপ গোস্বমী পূর্ব উল্লেখিত দুইটি শ্লোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন।

অন্তর্দৃষ্টির অর্থ স্বরূপের পরিচয়। এক চেতনসত্তা অপর চেতনসত্তার পরিচয় সঠিক পেতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি নিজ দেহের অনুভব সহজেই পেতে পারে, সেই প্রকারে আনন্দরসানুভব অন্য আনন্দরসানুভবকে ঠিক চিনতে পারে। ললিতা সখী নিজের প্রিয়সখী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণপ্রেমরসানুভব ঠিক ধরতে পারেন। তাই স্বরূপ দামোদর শ্রীমতীর রসানুভবকে "রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি" শ্লোকে তাহাই ব্যক্ত করতে পেরেছেন।

রাধাকৃষ্ণ ত' স্বরূপতই এক অভিন্ন। কেবল দেহ মাত্র দুই। এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে উভয়ই এক দেহ ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীরূপেই প্রকট হয়েছেন।

ঐ শ্লোকে স্বরূপ দামোদর রাধাকৃষ্ণের ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা এক এবং অভিন্ন নিত্য লীলা বলে প্রকাশ করেছেন। শীতঋতু প্রথমে না গ্রীষ্মঋতু প্রথমে আসে এটি বলা যেরূপ কঠিন, সেই প্রকারে নিত্য লীলা চক্রবৎ চলতে থাকে। কৃষ্ণলীলা আগে না চৈতন্য লীলা আগে এ কথা বলা কঠিন;কারণ উভয় লীলা চক্রবৎ নিত্য-আগে পরে এরূপ বিচার অবাস্তব। শ্রীরাধার স্বরূপ কি? কৃষ্ণমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠাই শ্রীরাধা। কৃষ্ণেরই অন্তরঙ্গা হ্লাদিনীশক্তি মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধাঠাকুরাণী। কৃষ্ণ এক অদ্বৈততত্ত্ব; কিন্তু লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁরই হ্লাদিনী শক্তি পৃথক্ করে দুই মূর্ত্তি ধারণ করেন। পুনশ্চ সেই মাধুর্য্যরস আস্বাদনের জন্যই দুইরূপ, অর্থাৎ শক্তিমান কৃষ্ণ ও শক্তির তিন (হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সংবিৎ) প্রকাশ মিলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে প্রকটিত হয়ে লীলারস আস্বাদন করেন।

সূর্য্য ও তার কিরণ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তিকে যেমন পৃথক্ করা যায় না, সেই প্রকার লীলারস আস্বাদনের জন্য কৃষ্ণ ও রাধা দুই পৃথক রূপ ধারণ করলেও তাঁরা এক-অভিন্ন।

এই অদ্বয় অভিন্ন হয়েও কখন এক হন, কখন দুই হন; কখন মিলিত হন কখন বিচ্ছিন্ন হন। মিলন ও বিচ্ছেদ উভয় এর মধ্যেই মিলনানন্দ আস্বাদন করেন। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব কি রূপ তা শ্রীরূপ গোস্বামী এই ভাবে প্রকাশ করেছেন—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাব-কুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোরমান উদঞ্চতি।।

অর্থাৎ যেমন সর্প স্বভাবতঃ কুটিলা গতিতে চলে, প্রেমের গতিও ঠিক সেই প্রকার। প্রেমের গতি কখনও সরল রেখায় চলে না। তাই প্রেমিক-প্রেমিকার কখন কখনও মান-অভিমান, মিলন-বিরহ বিনা কারণেই লেগেই থাকে। তাতে কারণ থাক আর নাই থাক। আর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের মধ্যে বিরহ স্বাভাবিক লীলারস আস্বাদনের চমৎকারিতা বৃদ্ধির জন্য একান্ত অপরিহার্য্য।

বিরহ বেদনা

আলঙ্কারিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, নায়ক-নায়িকা বা প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ্যত চারটি অবস্থায় বিরহ দশা অনুভূত হয়ে থাকে, যথা— পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও প্রেমবৈচিত্ত্য।

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি অর্থাৎ কান্তরসাশ্রিত প্রেমভক্তি রাজ্যে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রিয়ার মধ্যেও ঠিক সেই চারটি অবস্থার বিরহদশা ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি ও প্রীতিসন্দর্ভ ইত্যাদিতে আলোচিত হয়েছে। ভক্তি রাজ্যে প্রেমের একমাত্র বিষয় শ্রীকৃষ্ণ-দ্বিভুজ-মুরলীধর ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ এবং কান্তাপ্রেমের একমাত্র আশ্রয় বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণী। এই উভয়ের প্রেমলীলাবিলাসের প্রথম অবস্থা 'পূর্বরাগ'।

এই পূর্বরাগ অবস্থা হচ্ছে মিলনের বা দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বাবস্থা। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা-কেউ কাউকে এপর্যন্ত দেখেন নাই, কেবল একে আরেকের নাম শুনেছেন, বা চিত্রপট দেখেছেন বা রূপ-গুণ-শীলাদির বর্ণনা কারো মাধ্যমে শুনেছেন। শ্রীমতী হয় ত' কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনেছেন, কৃষ্ণও কেবল রাধা— এই নামটি মাত্র শুনেছেন। এতেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগ বা দেখা-সাক্ষাতের পূর্বে-রাগ-অনুরাগ বা "পূর্বরাগ" উৎপন্ন হয়েছে;কি কৃষ্ণ কি রাধা-কেউ আর নিজেকে সামলাতে পারছেন না। শ্রীরাধারাণী "কৃষ্ণ"— এই নামটি শুনামাত্রই তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠে যার নাম মাত্র শুনেই আমার এই অবস্থা হয় যার এত মাধুর্য্য, যার চিত্রপট দেখেই চিত্ত এত ব্যগ্র হয়ে উঠে— তাঁকে কি করে পাব? পাওয়ার জন্য উভয়েই ব্যগ্র আকুল কিন্তু পাওয়ার রাস্তা কৈ? এই না পাওয়ার ব্যথাই বিরহবেদনা। তা অসহ্য হলেও সহ্য করতে হচ্ছে— এ কি কম বেদনাদায়ক! উভয়ই পরস্পরকে পাওয়ার জন্য আকুল কিন্তু এখনও মিলনের কোন আশাভরসা দেখা যাচ্ছে না। এইটিই পূর্বরাগ জন্য বিরহ।

"মান" আর একপ্রকার বিরহ—তাতেও বেদনা। মান কখন হয়? মিলন হওয়ার পর সামান্য কারণেই কিছু ভুল বোঝা হয়ে গেল— উভয়ের দিক্ থেকে। এটি প্রেমেরই স্বভাব। তাই রূপ গোস্বামী বলেন— প্রেমস্য কুটিলা গতিঃ— কেমন কুটিল— অহেরিব— সর্পের গতির মত। অতো হেতোরহেতোর্বা যূনোরমান উদঞ্চতি। কারণ থাক আর নাই থাক, উভয়ের মধ্যে উভয়ের প্রতি ধারণা জন্মায়— আমায় অবহেলা করা হচ্ছে না ত'? এতেই শ্রীমতী আর আমায় দরকার নাই—এই ভেবেই উভয়ে উভয়কে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু বাহিরে এরূপ হয় বটে, অন্তরে কিন্তু পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যায়—বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়।

প্রেম-বৈচিত্ত্যঃ অপ্রাকৃত অসূয়া

এই অবস্থায় অসূয়া এমন একটি স্তরে উভয়কে নিয়ে যায় যে, উভয়ের মধ্যে দূরত্ব যেন অনেকখানি, বাহির থেকে এই রকমই মনে হয় যেন কেউ কাউকে আর দেখবেই না; অথচ ভেতরে তার ঠিক বিপরীত অবস্থা। প্রেম বৈচিত্ত্য কেবল মাধুর্য্যরসের বেলায় হয়ে থাকে। কৃষ্ণ রাধারাণীর কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণের উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গে রাধারাণী নিজ ছায়ার প্রতিবিম্বকে দেখেই তাকে আর এক নারী মনে করে নিলেন, তখন তাঁর হৃদয়ে এমন অসূয়া জেগে উঠল যে, তিনি তাতে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নিজের বিদ্রোহভাব প্রকাশ করে ফেললেন। কিন্তু সখী ললিতা তাঁকে বলতে বাধ্য হলেন, "তুমি একি করছ ও ত তোমারই ছবি, তাঁর শ্রীঅঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, তা তুমি বুঝতে পারছ না ? কি আশ্চর্য !

তখন শ্রীমতী রাধারাণী সচেতন হয়ে নিশ্চিত হন— ও ! ও তা' হলে আমারই ছবি অন্য কোন নারী নয়। সাময়িক বিরহবোধ তখন চলে যায়।

আর একটি প্রেম-বৈচিত্ত্যের উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে। এক সময় কৃষ্ণ ও রাধারাণী একত্র চলেছেন;সঙ্গে মধুমঙ্গলও চলেছেন। তিনজনের মধুর আলাপও হচ্ছে, এক ভ্রমর রাধাকৃষ্ণের পাদপদ্মের মধুর সৌরভে মত্ত হয়ে গুণ গুণ গুঞ্জন করে চল্‌ছে। হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল। মধুমঙ্গল বলে ফেললেন,—

আরে ! মধুসূদন (ভ্রমর) কোথায় চলে গেল ? এই শোনা মাত্রই রাধারাণী — আঁ মধুসূদন (কৃষ্ণ) চলে গেছেন ?— এই বলেই কৃষ্ণবিচ্ছেদ যন্ত্রনায় কাতর হয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। এই প্রকার সাময়িক বিরহ-বেদনা বিধুরতাকে বলা হয় প্রেম-বৈচিত্ত্য।

এই সমস্ত অনুভাব প্রেমের অতিউচ্চস্তরের ব্যাপার। এই প্রকার বিরহ বেদনা এসে উভয়ের মিলনরসকে অধিক গাঢ় করে থাকে। এ কেবল অতীন্দ্রিয় অপ্রাকৃত প্রেমেই সম্ভব। আর এক বিরহের নাম 'প্রবাস'। প্রবাস বিচ্ছেদ দুই প্রকার— স্বল্প সময়ের জন্য বিচ্ছেদ এবং অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দূরদেশান্তর প্রবাস। যেমন, কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করে মথুরা তারপর দ্বারকা চলে গেলেন। সেখানে শত্রুজয়, রাজ্য শাসন ইত্যাদিতে ব্যস্ত হয়ে থাকলেন ! বৃন্দাবনে ফিরে এসে গোচারণ, ক্রীড়া, কৌতুক, নিভৃতনিকুঞ্জে রহঃলীলা বিহার ইত্যাদির পুনরাবৃত্তি স্থূলতঃ আর হোল না।

এ সমস্ত অপ্রাকৃত লীলাবিলাস এত উচ্চস্তরের ব্যাপার যে, তা মানুষের সাংসারিক বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে যাওয়া উচিত নয়। কারণ এসব প্রাকৃত জগতের জ্ঞান,

বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা দিয়ে অপ্রাকৃত চিৎজগতের ব্যাপারের বিচার করলে আমাদের অপরাধ হওয়া সম্ভব। আমাদের এই অনুচৈতন্য সত্তা দিয়ে সেই অপ্রাকৃত নিত্য গোলোকের লীলারহস্য অনুশীলন করা ধৃষ্টতা মাত্র।

সুতরাং রাধা-গোবিন্দের মিলন লীলাবিলাস অপেক্ষা বরং বিরহ-বিধুরলীলা অনুশীলন অধিক নিরাপদ কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁদের বিরহলীলা আমাদের জাগতিক নর-নারীর মত নয়, তা কোন জাগতিক ঘটনা আদৌ নয়। এই প্রকার সাবধান হয়েই আমরা শ্রীরাধা-গোবিন্দের অপ্রাকৃত বিরহ লীলা কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করতে পারি।

জাগতিক নর-নারীর মিলন-বিচ্ছেদের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলা সমগোত্রীয় মনে করা প্রচণ্ড অপরাধ। রাধাগোবিন্দের মিলন লীলাকে জাগতিক প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের প্রতিরূপ মনে করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণের বিরহে চিন্তা করছেন, "কৃষ্ণবিনা জীবন রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তাঁর কৃপা, তার সঙ্গবিনা এই বৃথা জীবন আমার অসহ্য।"

এই প্রকার চিন্তা ধারা আমাদের ভজনের সহায়ক। কিন্তু এটি অনুকরণের কথা নয়—আমরা সাধন ভজনের যতই নিম্নস্তরে থাকি না কেন, আমরা নত মস্তকে আমাদের সাধনার চরম স্তরে সেই প্রেমলীলাময়ীর সেবা দাস্যকেই জীবনের একমাত্র সিদ্ধিরূপে লাভ করার কাতর প্রার্থনা জানাব। তাতেই আমাদের যাবতীয় দুর্দ্দশা, অনর্থ সবই শেষ হয়ে যাবে। প্রার্থনার সময় ভাবাবেগে আমাদের চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু দু ফোঁটা ঝরে গেলেই যেন আমরা মনে না করি যে, আমরা সেই সিদ্ধ অবস্থায় পৌঁছে গেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই অশ্রু ঝরিয়ে বলতেন:

> ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
> ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
> বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
> বিভর্মি যৎ প্রাণ পতঙ্গকান্ বৃথা।।

হে সখী! কৃষ্ণে আমার প্রেমের গন্ধও নাই। তবে যে অশ্রু ঝরাই, তা ত' কেবল লোক দেখান, কারণ, কৃষ্ণকে দেখতে পাই না। অথচ আমি বেচেঁ আছি।

> দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপট প্রেমের বন্ধ
> সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
> তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন
> করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়।।

রাধাভাবভাবিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যদি এই অভিব্যক্তি হয়, তবে আমাদের সাময়িক ভাবপ্রসূত যে অশ্রু, তার স্থান কোথায়, তা' আমাদের ভেবে দেখা উচিত।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা গ্রহণ করলেন তাঁর উদ্দেশ্য নবদ্বীপবাসী প্রেমের টানে বিরহদশার প্রকৃত অবস্থার পরিচয় লাভ করুক।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সংবাদ শুনে মাতা শচীদেবী কেঁদে আকুল বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অসহায়, তাঁর অবস্থা চিন্তা করার কেউই নাই। এই পরিস্থিতিতে তিনি গৃহত্যাগ করলেন কেন? তিনি যে দিব্য কৃষ্ণ প্রেম দিতে অবতীর্ণ হয়েছেন, তা যেন নবদ্বীপবাসী অনুভব করতে পারে! তাই ত' হোল। নবদ্বীপের অধিবাসী, যারা পূর্বে মহাপ্রভুর প্রতি অনাদর ভাব পোষণ করেছিল তারা ত' স্বচক্ষে দেখতে পেল—তাদের মঙ্গলের জন্য মহাপ্রভু কত দূর ত্যাগ করতে পারেন। এই ত্যাগ দেখেই ত' তারা প্রভুর প্রতি অনুকূল ভাব পোষণ করল—তাঁর ত্যাগ দেখে তাঁর প্রতি সহানুভূতি তাদের বেড়ে গেল। প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক হল।

আমি বৃন্দাবনে যাব

কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসগ্রহণের শাস্ত্রীয় স্মৃতি সম্মত কর্ম শেষ হওয়ার পর মহাপ্রভু একপ্রকার উন্মাদ গ্রস্ত হয়ে বললেন, আমি এখন বৃন্দাবনে চলে যাব। আমি এখন যাবতীয় সাংসারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, এখন সব পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণসেবায় লেগে যাবো।

এই বলে তিনি শ্রীমদ্ ভাগবতের এক সন্ন্যাসীর উপাখ্যানের একটি শ্লোক পাঠ করতে লাগলেন। এটি শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩ অধ্যায় ৫৮ শ্লোকে একজন ব্রাহ্মণের সন্ন্যাস গ্রহণ প্রসঙ্গে শ্রীউদ্ধবকে বলেছিলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্বতমৈর্মহদ্ভিঃ
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব।।

প্রাচীন ঋষিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করে তার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি এখন সেই সন্ন্যাস বেশ গ্রহণ করেছি। এখন আমি সব পরিত্যাগ করে বৃন্দাবন ধামে গিয়ে কৃষ্ণের সেবা করব। তার দ্বারা মায়ার সংসার থেকে মুক্তিপাব। বৃন্দাবনে গিয়ে মুকুন্দ, কৃষ্ণ নামকীর্ত্তন করে নিজেকে পূর্ণরূপে কৃষ্ণ সেবায় ধন্য করব।

সন্ন্যাসীর বেশ কেবল একটা বাহিরের আচরণ, তাতে সাংসারিক জঞ্জাল থেকে নিজেকে পৃথক রাখামাত্র, সন্ন্যাসের আসল লক্ষ্য হল মুকুন্দ সেবা। এই ভাবে ভাবিত হয়েই মহাপ্রভু সন্ন্যাস কর্মের সমাপ্তির পর কাটোয়া থেকে পাগলের মত বৃন্দাবনের দিকে কৃষ্ণনামসহ নাচতে নাচতে দৌড়াতে আরম্ভ করলেন এবং একটা অরণ্য রাস্তায় প্রবেশ করলেন। মনে মনে কেবল ভাবলেন— বৃন্দাবনে পৌঁছেই একটু নির্জন স্থান বেছে নিয়ে বসে যাব আর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতে থাকব।

এই ভাবে মহাপ্রভু সন্ধ্যার কাছাকাছি বনের রাস্তা ধরে দৌড়ে যেতে থাকলেন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, চন্দ্রশেখর আচার্য্য, মুকুন্দ দত্ত প্রভৃতি তাঁর পাছে পাছে চললেও অনেকটা তাঁর থেকে দূরে থেকে চলতে হল। হঠাৎ মহাপ্রভু রাস্তায় পড়ে গেলেন, কৃষ্ণ কৃষ্ণ উচ্চারণ করে উঠেই দে দৌড় কখন পূর্ব, কখন পশ্চিম, কখন আবার উত্তর— এমনি দিশেহারা হয়েই দৌড়তে থাকলেন।

প্রেমাবেশে দিশাহারা

কখন কখনও জোরে দৌড়াতে দৌড়াতে বনের মধ্যে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে যেতেন— বোধ হয় প্রভু আমাদের ছেড়েই চলে গেলেন!

কিন্তু হঠাৎ তাঁরা দূর থেকে শুনতে পান-কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শব্দ—স্বরটা অতি করুণ রোদনের মত। তাঁরা সেই দিক্ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়ে দেখেন— মহাপ্রভু শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে আর্ত্ত কণ্ঠে গাইছেন,—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।

— কোথায় আমার প্রাণারাম কৃষ্ণ, তাঁর অদর্শন তাঁর বিচ্ছেদ আর সহিতে পারি না, কোথায় আমার প্রাণধন ব্রজেন্দ্রনন্দন! কে তাঁর বংশীতে তান ছেড়েছে, অমি এখন কি করি, কোথায় যাই?— কোথায় সেই নন্দ নন্দনকে পাব? — মর্মবিদারী করুণ স্বরে তিনি ক্রন্দনরত! একেবারে পাগলপারা অবস্থা— দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই!

কখন হয়ত' কাউকে দেখার মত বলে উঠেন কে তুমি? আমি বৃন্দাবনে যাচ্ছি, তুমি আবার কেন এসে আমায় বিরক্ত করছ?

এই অবস্থার সঙ্গীগণ তাঁর সেবা শুশ্রষা করে আবার বৃন্দাবনের দিকে পশ্চিমে, উন্মাদ অবস্থায় সঙ্গীরা অনুসরণ করে পশ্চিমে বৃন্দাবনের দিকে তারা প্রভুকে যেতে দেন না।

এক সময় নিত্যানন্দ প্রভু তাঁকে বৃন্দাবনেই ত' নিয়ে চলেছি বলে কায়দা করে শান্তিপুরের দিকে প্রভুকে নিয়ে চলেন।

চৈতন্য ভাগবতের উল্লেখ থেকে পাওয়া যায় কাটোয়া থেকে তারা গিয়ে বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থেকে ছয় মাইল উত্তর পূর্বে বক্রেশ্বর অজয় নদীর ধারে বিশ্রাম তলায় পৌঁছে যান। এই বিশ্রামতলা নাম হয়েছে মহাপ্রভু সেখানে কিছু সময় বিশ্রাম করেছিলেন বলে।

এইভাবে মহাপ্রভু বৃন্দাবনে চলেছি ভেবে পশ্চিম থেকে পূর্বের দিকে শান্তিপুরে পৌঁছান।

প্রায় তিন দিন তিনরাত এইভাবে ভ্রমণ করে নিত্যানন্দ প্রভুর কৌশলে তাঁরা কালনা হয়ে শান্তিপুরে আসেন। আঁ! এ তাহলে গঙ্গা! তাই ত দেখছি।

মহাপ্রভু এখন সচেতন হয়ে গেছেন । ও! তাই নিত্যানন্দ বুঝি চালাকি করে আমাকে যমুনা বলে ঠকিয়ে গঙ্গাতীরে নিয়ে এসেছে। এত রীতিমত ধাপ্পাবাজী। শেষে নিত্যানন্দের কাছে ফেঁসে গেছি দেখছি।

অদ্বৈত নিত্যানন্দের পক্ষ হয়ে বললেন না প্রভু। তা নয়। নিত্যানন্দ আপনাকে ত' মিথ্যা বলেন নি। আপনি ঠিকই যমুনায় স্নান করেছেন।

এলাহাবাদে গঙ্গা এসে যমুনায় মিলিত হয়েছেন। শাস্ত্রমতে এলাহাবাদ থেকে প্রবাহিত গঙ্গার পূর্বধার গঙ্গা এবং পশ্চিমধার যমুনা। আপনি ত' গঙ্গার পশ্চিমধার যমুনাতেই স্নান করেছেন। এখন ওসব কথা থাক। আমি নববস্ত্র এনেছি। ভেজা বস্ত্র ছেড়ে এই বস্ত্র পরিধান করুন। এতদিন আপনি ও সঙ্গীগণ কিছুই আহার করেন নি আমার গৃহে পদধূলি দিয়ে এই দরিদ্র গৃহস্থের প্রতি কৃপা করে ভিক্ষা গ্রহণ করুন।

এই বলে মহাপ্রভুকে নৌকায় করে সকলে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে পৌঁছালেন। পরের দিন নবদ্বীপ থেকে শচীমাতা এবং অন্যান্য ভক্তগণ এসে উপস্থিত হলেন।

শান্তিপুরে ভক্তগণসহ প্রায় ১০/১২ দিন অবস্থান করে মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্র জগন্নাথধামের দিকে যাত্রা করেছিলেন।

বৃন্দাবন ধাম কি? কোথায়?

প্রকৃত বৃন্দাবন ধাম কি? তার স্বরূপ কি, তার অবস্থান কোথায়?— এ সমস্ত দিব্যচেতনার চরম স্তরের কথা। স্থূল ভৌগলিক সীমার বিষয় বস্তু নয়।

সব স্থূল বা সূক্ষ্ম বস্তু পরাৎপর পরমব্রহ্ম স্বরূপের স্বতন্ত্র ইচ্ছার উপর নির্ভর

করে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভুল পথ দেখিয়ে মহাপ্রভুকে কালনা হয়ে শান্তিপুর পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন। তারপরই তিনি গৈরিক-সন্ন্যাসী বেশ ধরে মহাপ্রভুর সামনে দাঁড়াতেই মহাপ্রভু মনে করলেন আমি ত' বৃন্দাবনে এসেছি;এও ত' আমার মত এক সন্ন্যাসী। তাই মনে করে মহাপ্রভু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

শ্রীপাদ আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

নিত্যানন্দ— আমিও আপনার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাব।

মহাপ্রভু — এখান থেকে বৃন্দাবন কতদূর?

নিত্যানন্দ গঙ্গানদীকে দেখিয়ে বললেন — দেখুন, এই ত যমুনা।

মহাপ্রভু যেন আশ্বস্ত হয়ে বললেন—

তাহলে আমরা যমুনার কাছে এসে গেছি।

তারপর মহাপ্রভু যমুনায় স্নান করে যমুনার স্তুতি পাঠ করে প্রণাম করলেন,—

চিদানন্দ ভানোঃ সদানন্দসুনোঃ
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।
অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী
পবিত্রী ক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী।।

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, কবি কর্ণপূর)

হে সূর্য্যতনয়া! যদিও তুমি জলব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ, তথাপি তুমি নন্দনন্দন কৃষ্ণের অতি প্রিয়। সেই নন্দনন্দনই ত' সূর্য্যরূপে প্রকাশমান। তুমি জগতের পাপসমূহকে দূর করে থাক। আমার এই শরীরকে পবিত্র কর।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়েই নিত্যানন্দ প্রভু চন্দ্রশেখর আচার্য্যকে শান্তিপুরে পাঠিয়ে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে সব কথা বলে প্রস্তুত হয়ে গঙ্গাতীরে আসার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

মহাপ্রভু স্নান সেরে উঠেই দেখেন অদ্বৈতাচার্য্য সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলে উঠলেন, আপনি না অদ্বৈতাচার্য্য! আপনি কি করে জানলেন আমি বৃন্দাবনে এসেছি?

অদ্বৈতাচার্য্য বুঝলেন— কিছু একটা রহস্য আছে, বললেন— আপনি যেখানে যান, সেইটাই বৃন্দাবন। তবে আমার ভাগ্যে আপনি গঙ্গাতীরে এসে পৌঁছেছেন। তিনি ইচ্ছা করলেন আলোকের প্রকাশ হোক — অমনি আলোক প্রকাশিত হল। তিনি ইচ্ছা করলেন— জল, অগ্নি, পৃথিবী ইত্যাদি প্রকাশিত হল।

খ্রীষ্টধর্মের গ্রন্থ বাইবেলেতে এই প্রকার পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্টির কথা আছে।

পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন শাস্ত্র বেদে রয়েছে— "স ঐচ্ছৎ স অকাময়ৎ - একোঽহং বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।"

আমরা সকলেই বস্তু জগতের, স্থূল বাস্তব রাজ্যের ব্যক্তি। আমাদের স্থূলদৃষ্টি বা মানস দৃষ্টির উর্দ্ধে যে আর একটি অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত রাজ্য রয়েছে এবং সেই রাজ্য ও স্রষ্টারই অদৃশ্য ইচ্ছা বা ইঙ্গিতে চলে। আমরা কেবল এই ইন্দ্রিয় সাধ্য গণ্ডীর মধ্যেই যা কিছু করি বা দেখি, সে সমস্তই আর একটি অদৃশ্য সর্বময় সর্বোপরি কর্ত্তা-স্রষ্টার অধীনে তাঁর নিয়ন্ত্রণেই চলে, তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত সবই অচল অবাস্তব হয়ে যায়।

কেবলমাত্র নির্মল বিশুদ্ধ চৈতন্য সত্তার সাহায্যেই আমরা সেই স্থূল সূক্ষ্ম সৃষ্ট জগতের প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞান লাভ করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্ময় চক্ষেই দেখতে পাই বৃন্দাবন সর্বত্রই বিদ্যমান।

মহাপ্রভু কেবল প্রেমোন্মাদনার বশেই এদিক্ ওদিক্ বৃন্দাবন যাত্রার লীলা প্রকট করলেন। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যই প্রভুকে বুঝিয়ে দিলেন আপনি বৃথাই হেথা ওথা বৃন্দাবন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আপনি যেখানে, বৃন্দাবন ত' সেইখানেই, বৃন্দাবন আর আপনি কি দুটো আলাদা বস্তু? কেবল আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আপনি এসব নাটক করে চলেছেন, বৃন্দাবন যে আপনি নিজেই বৃন্দাবনবিহারী যে আপনি নিজেই, তা কি আমরা বুঝি না? বৃন্দাবন কোথায়! বৃন্দাবন কোথায়— এসব ভেলকি রাখুন।

প্রেমের রাজ্য — বৃন্দাবন

দিব্যচেতনার চরম লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবন তার স্থান সর্বোপরি; মর্য্যাদা পরিমণ্ডলের বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধে বৃন্দাবন। সহজ-সরল অনাবিল প্রেমের ধাম বৃন্দাবন। এই ধামের পরিকর গণ জানেন না যে, তারা বৃন্দাবনের অধিবাসী— এইটিই সে ধামের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য। তা অপ্রাকৃত—প্রকৃতির অতীত সর্বোচ্চ স্তরের চিন্ময় লীলা বিলাস ক্ষেত্র।

জ্ঞানের পাঁচটি স্তর আছে। সর্বনিম্নস্তর হল প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ-জাত যা আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও স্পর্শ দ্বারা লাভ করি। এইটিই প্রথম স্তর।

প্রত্যক্ষ থেকে একটু উন্নত স্তর হচ্ছে-পরোক্ষস্তর যা আমরা নিজের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে না পেয়েও অন্য কর্ত্তৃক লব্ধ জ্ঞান থেকে পেয়ে থাকি। যেমন বৈজ্ঞানিকগণের উদ্‌ভাবন ও আবিষ্কার থেকে লাভ করে থাকি।

তৃতীয় উচ্চতর স্তর হচ্ছে অপরোক্ষ। এটি একপ্রকার সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রা জনিত।

গাঢ়নিদ্রায় আমরা সাধারণ চেতনাস্তরে থাকি না। নিদ্রাভঙ্গের পরে পরে কিছু কিছু আবছা আবছা মনে থাকে। সুষুপ্তি অবস্থায় ব্যক্তি ও বস্তুর সত্তা ও ক্রিয়ার স্মৃতি জাগ্রত অবস্থায় আস্তে আস্তে যেন মিলিয়ে যায়।

নির্বিশেষবাদী আচার্য্য শঙ্কর চেতনাস্তরকে এই প্রকারে বিভক্ত করেছেন।

তুরীয় অবস্থা

আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সচেতনতার এই তিন অবস্থার উপরে আর এক চতুর্থ বা শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তুরীয় অবস্থার কথা বলেছেন, তাকে বলা যায় অধোক্ষজ। (transandental) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা আছে যা কি ইন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞানের উন্নত চেতনা। তা স্থূল-সূক্ষ্ম বস্তু সন্নিকর্ষ জনিত জ্ঞানগম্য নয়, তার ঊর্দ্ধে। (অধঃকৃতং অক্ষজজ্ঞানং যেন— ইতি অধোক্ষজঃ)।

এই অধোক্ষজ জ্ঞান আমরা কখন কি কারণে পাই? উত্তর হল, সেই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়জ চৈতন্য স্তরে আপনি কৃপাপূর্বক নেমে আসে। সেই অদৃশ্য সত্তার করুণা ধারার প্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলে আর আমরা শত চেষ্টা করে তা পাই না।

সেই অদ্বয়তত্ত্ব-সত্যম্ অনন্তম্ ব্রহ্মসত্তা আমাদের ইন্দ্রিয়াধীন নন। আমরা তা মাপ্‌তে পারি না। তা সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সত্তা। তিনি যখন কৃপা করে নেমে আসেন, তখন আমরা শরণাগত—প্রপন্ন চিত্তের দ্বারা সেই উচ্চতর ভূমিকার বিভুচৈতন্য সত্তার অনুভব লাভ করতে পারি, বলপূর্বক নয়।

ঐ অধোক্ষজ চৈতন্য স্তরের নাম বৈকুন্ঠ অপরিমিত সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য্যের পরব্যোম-ধাম। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ— এ সবের অতীত অধোক্ষজ তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন তত্ত্ব। এই জগতের মানদণ্ড দিয়ে তার পরিমাপ অসম্ভব।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের উক্ত চারিটি চেতনস্তরের উপরে আর একটি অর্থাৎ পঞ্চম স্তরের সন্ধান দিয়েছেন— তার শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা— অপ্রাকৃত। তা আপাতদৃষ্টিতে প্রকৃতি জাত জগতের ব্যাপারের মত, কিন্তু, তা নয়। সেই অপ্রাকৃত ধামের নাম "গোলোক ধাম" সেই ধামের সর্বেশ্বর — কেবল একজন মাত্র – তাঁর নাম কৃষ্ণ। কেন্দ্র সেই সর্বোচ্চ কেন্দ্র বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কের একমাত্র সূত্র – প্রেম divine love।

প্রেমের সংস্পর্শে সবই সুন্দর হয়ে যায়, প্রেমময় হয়ে যায়। বাৎসল্য প্রেমময়ী জননীর চক্ষে তাঁর অন্ধ পুত্রও অতি সুন্দর; তার কারণ সেই জননীর চক্ষুই অন্ধ— প্রেমে অন্ধ।

সুতরাং যা কিছু হেয়, নীচ, ঘৃণ্য, তাও প্রেমের আলোকে প্রেয় হয়ে যায়, আদরের বস্তু হয়ে যায়। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন-সবই প্রেমময় হয়ে যায়।

রাজ্যের মহারাজ যখন দয়া, করুণা, স্নেহ, প্রীতির চক্ষে দর্শন করেন, তখন রাস্তার একটি অবোধ শিশুও তাঁর চক্ষে সুন্দর দেখায়, তিনি তার সঙ্গে খেলা করতে নেমে আসেন। উচ্চ-নীচ, সুন্দর-অসুন্দর সব ভেদভাবকেই দূরে সরিয়ে দিতে পারে এই স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, ভালবাসা divine Love।

সম্মোহিনী শক্তি

কর্মযোগ, রাজযোগ বা জ্ঞানযোগ — এই সীমা পর্য্যন্ত ত্যাজ্য-গ্রাহ্য, শ্রেয়-হেয়, উচ্চ-নীচ— এই সমস্ত ভেদবুদ্ধি থাকে। কিন্তু ভক্তিতে— প্রেমেতে সবই উলট-পালট হয়ে যায়। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনে সবই সুন্দর, সবই প্রিয়, সবই গ্রাহ্য, প্রেয়, শ্রেয় হয়ে যায়। প্রেম এমনই সম্মোহিনী শক্তি— অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তির মূখ্যবৃত্তি।

বৃন্দাবনের অধিবাসীগণ নিজেকে মনে করেন তারা অতি সাধারণ মানুষ। এরাই জ্ঞান-শূন্যা ভক্তগোষ্ঠী। কৃষ্ণের প্রতি এঁদের কেবল প্রেম। তাদের প্রেমের কাছে কোন ঈশ্বরত্ব, ভগবত্তা, ঐশ্বর্য্য— এসবের কোন মূল্য থাকে না।

সুতরাং ভক্তি, প্রেম— এ সমস্ত বৈকুণ্ঠে পাওয়া অসম্ভব, সেখানে ত' কেবল ঐশ্বর্য্য। কিন্তু বৃন্দাবনে যোগমায়াই ভক্ত ও ভগবান্‌কে, ব্রজবাসী ও কৃষ্ণকে, ঐশ্বর্য্য, গৌরববোধ প্রভৃতি ভাব-বোধকে আবরণ করে রাখে।

ব্রজবাসীগণ জানেনই না যে, তাঁরা কত সৌভাগ্যবান্। এ সমস্তই কেবল যোগ-মায়ার ক্রিয়া, কৃষ্ণের মধুরলীলার পরিপোষকতাই যোগমায়ার কার্য্য।

অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে বললেন, তুমি যেখানে থাক, সেইটাই বৃন্দাবন। নরোত্তম ঠাকুরও বলেন, যেখানেই আমরা একজন কৃষ্ণভক্ত পাই, সেইখানেই বৃন্দাবন আবির্ভূত হন।

"যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন" (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

ব্রহ্মা, উদ্ধব প্রভৃতি মহান্ ব্যক্তি যে ব্রজবাসীগণের পদধূলি পাওয়ার জন্য বৃন্দাবনে তৃণ-গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করেন, সেই ব্রজবাসীগণ কিন্তু নিজেকে অতি সাধারণ মনে করেন। তাঁদের মহত্ত্ব স্নেহ-প্রেমের আভরণে এবং দৈন্যের মঞ্জুষায় লুকিয়ে যায়। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ ও গোপ-গোপীগণ বনেই থাকেন, বনেই লীলাখেলা করেন। সেখানে মরজগতের সুরম্য রাজপ্রসাদ নাই— ভোগ-বিলাসের মহার্ঘ উপকরণ নাই। অথচ

তাদের সহজ, সরল প্রকৃতিদত্ত উপহার প্রেমপুটিত হয়ে বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য-ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দেয়। সুমধুর সুন্দর স্নিগ্ধপ্রেম-স্নাত যোগমায়াবিভবে বৃন্দাবন বৈভবমণ্ডিত। বৃন্দাবনরাজ্যে কৃষ্ণই— সমস্ত প্রাণী ও বস্তুজগতের কেন্দ্রবিন্দু— যমুনা পুলিন, বন, পর্বত গোপ-গোপীগণ-সবই বৃন্দাবনের চিদানন্দ প্রেম পরিবেশকে মধুময় করেছে।

মহাপ্রভু কেবল আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই আমাদের সেই চিন্ময়ধামে নিয়ে সেখানকার স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার সুযোগ দেবার জন্যই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। কারণ আমাদের নিত্য চিন্ময় স্বরূপ ত' সেই ধামেরই নিত্যসেবক-সেবিকা। দুর্দ্দৈবশতঃ আমরা বহির্মুখ হয়ে পড়েছি সৃষ্টির অনিত্য জড় স্বরূপের আবরণে আবদ্ধ হয়ে কষ্ট ভোগ করছি। এ সবই ত কেবল মায়া-মোহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ অবস্থাটা ত' আমাদের কেবল অত্যাসক্তি, উন্মত্ততা ও বদখেয়াল মাত্র। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতেই হবে। একটা পাগল যেমন ঘর-দোর ছেড়ে রাস্তায় ঘুরে খড় কুটো কুড়াতে থাকে, আমরা ত' সেই রকম ভবঘুরের মত ঘুরপাক খাচ্ছি;যখন এ পাগলামি ছেড়ে যাবে, তখন পথে আসবো— স্বগৃহে ফিরে যাব।

একটা সাংঘাতিক বিষাদ-বিপন্ন অবস্থা

এই অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আমরা স্ব-স্থানে ফিরে যাবই। কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই এসে ডাক দিয়েছেন— তোমরা স্ব-স্থানে ফিরে চল, সেখানেই তোমার মধুর নিকেতন, এখানে নয়।

এখানে ত সর্বদা সংগ্রাম, সংঘর্ষ, রোগ, শোক, মহামারি, ভূকম্প, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ইত্যাদি লেগেই আছে। তোমাদের দুর্দ্দৈব এইটাই যে, তোমার নিজের নিত্য-স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এই দেহ-গেহ, সংসার, জগৎটাকে একাত্ম করে নিয়েছ, এই রক্তমাংসের দেহটাকেই তুমি বলে ধরে নিয়েছ। এখন তোমাকে তোমার আসল পরিচয় খুঁজে নিতে হবে।

এই ত' এখন দরকার। আমাদের স্ব-ধাম যে এত সুন্দর, এত সুখময়, এত আনন্দময়, এত মধুর চিন্ময় ধাম। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ত' এই জন্যই, আমরা যাতে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিই— আমরা আমাদের স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে ফিরে যাই— এই প্রকার দিব্য চেতনা আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত করাবার জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস লীলা স্বীকার করলেন।

কিন্তু অপরপক্ষে নিজের স্বজন ভক্ত ও অনুগতগণের প্রতি অতি নির্মম, নির্দ্দয়

হতে হয়েছে তাঁকে কেবল আমাদের কল্যাণ কামনায় আমাদের স্বগৃহে ফেরানোর জন্য, একমাত্র প্রাণারাম কৃষ্ণ মিলনানন্দ আস্বাদন করার জন্য। তিনি নিজজনকে বিচ্ছেদবেদনা দিয়ে আমাদের মত পতিতজীবের উদ্ধারের জন্য নিজেও বিচ্ছেদ বেদনাকে স্বীকার করে নিলেন। তাঁর সন্ন্যাস মর্মান্তিক বিরহবেদনার অগ্নিশিখা।

আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে

সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রার ছলে নবদ্বীপে এসেছিলেন। কিন্তু লোক সংঘটের ভয়ে তিনি বিদ্যাবাচস্পতি (সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা) গৃহে রাত্রিবাস করেছিলেন। নবদ্বীপ এবং আশপাশের গ্রামের অধিবাসীগণ ভোর হতেই চারিদিকে এসে তাদের প্রিয় নিমাই পণ্ডিতকে দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহাপ্রভু বাচস্পতির গৃহের ছাদে উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে দর্শন দিলেন কিন্তু একি— কোথায় সুন্দর কুঞ্চিত কেশদাম শোভিত তাদের নিমাই পণ্ডিত? ইনি ত' গৈরিক বস্ত্র পরিহিত অপূর্ব দিব্যদর্শন সন্ন্যাসী!

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, যিনি বর্ত্তমানের বিশ্ববিশ্রুত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচেতনা ও কৃষ্ণানুশীলন সংঘের প্রথম পথিকৃৎ, তিনি তাঁর শ্রীরাধাগোবিন্দ ও উভয়ের মিলিত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নিত্যব্রজলীলা ও নিত্যনবদ্বীপলীলার সেবা সহচরীরূপে নিত্যই মানসনেত্রে দর্শন করে থাকেন তিনিই চৈতন্য লীলার এই দৃশ্য পটের সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজ-গোপ গোপীগণের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র লীলার সামঞ্জস্য লক্ষ্য করে নিজের সিদ্ধি-লালসা ব্যক্ত করে লিখেছেন—

আমি চাই গৌরচন্দ্রে লইতে মায়াপুরে।
যথায় কৈশোর বেশ শ্রীঅঙ্গেতে স্ফুরে।।
চাচর চিকুর কেশ ত্রিকচ্ছ বসনে ।
ঈশোদ্যানে লীলা করে ভক্তগণ সনে।।

রাজাধিরাজ পদবীতে ও বেশে সুসজ্জিত কৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শ ও মিলন-সুখ পেয়েও ব্রজবাসীগণ বৃন্দাবনের বংশীবদন, মাথায় ময়ুরচন্দ্রিকা চর্চ্চিত বনমালা সুশোভিত কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনের পল্লী পরিবেশ, যমুনা পুলিন, গোবর্দ্ধনের গিরিগহ্বর ও অরণ্য পথের লতা-বিতানে বিহার করার কামনায়, উৎকণ্ঠিত হলেও, তা আর হওয়া সম্ভব নয়, কৃষ্ণও ঐ রাজাধিরাজ পদ-পরিচ্ছদ দূরে ফেলে দিয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে এ

সম্ভাবনাও নাই। তাই কৃষ্ণ নিজেও যে বিচ্ছেদ-বেদনার মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কাতর, তাও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজেই অনুভব করছেন। অথচ তিনি নিজেও নবদ্বীপধামের একজন অধিবাসী রূপে তাঁদের মর্মবেদনার অনুভবী। সেই অনুভবীর অন্তরের ভাষা তিনি ব্যক্ত করে লিখছেন—

আমরা আর কি এমন দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পাব না— যেদিন আমাদের সেই নিমাই তাঁর এই সন্ন্যাসবেশ ফেলে দিয়ে পূর্বের সেই কুঞ্চিত কেশদাম সুশোভিত চন্দ্রবদনে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করে দুবাহুতুলে কৃষ্ণপ্রেমে অশ্রু ঝরাতে থাকবেন— হায় এমন দিন কবে আসবে ?

প্রেমসিন্ধুর একটি বিন্দু

একমাত্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই পরিপূর্ণ আস্তিকতার সার্থক ও যথার্থ বিজ্ঞান প্রকট করতে পারেন এবং করে গিয়েছেন। এ সামর্থ্য অন্যকোন সাধন সিদ্ধ বা যুগপুরুষ আচার্য্য অর্জন করেন নাই, ভবিষ্যতে তা কারো পক্ষে সম্ভবও নয়।

এটি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অসীম করুণা, তাঁর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সুমধুর প্রসাদ, তাঁর নিজসম্পদ, এতে অন্য কারও স্বত্বসম্পর্ক নাই। কৃষ্ণ অপ্রাকৃত অসমোর্দ্ধ স্বেচ্ছাচারী। তিনি স্বেচ্ছায় যাকে ইচ্ছে তাকে বেছে নিতে পারেন, তাতে কোন যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার করেন না। এযুগের স্লোগান "প্রতিনিধিত্ব নাই ত' খাজনা নাই"— কৃষ্ণের দরবারে এটা চলে না তাঁর রাজ্যে এপ্রকার আপত্তি অভিযোগ একেবারে অচল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অত্যন্ত পতিত আমাদিগাকে মঙ্গলের জন্য এই স্বৈরাচারী কারুণ্য সম্পর্কের মর্ম্মার্থ বুঝাবার জন্যই বুদ্ধিজীবির মত অভিনয় করে বলেছেন, আমি ত' কৃষ্ণের অধম দাস। কিন্তু কৃষ্ণ কোথায়? তাঁকে পাই কেমন করে? এমনতর হতভাগ্য আমি! আমি তা হলে কি? তাঁরই দাস নই কি? যদি তাঁরই দাস তবে তাঁকে পাইনা কেন? হায়! বিধির কি বিড়ম্বনা!

আমরা চিৎকার করে কাঁদতে পারি, অনুতাপানলে পুড়ে ছাই হতে পারি, কখনও বা নীরবে অঝোর নয়নে বুকভাসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কৃষ্ণ? তিনি ত' স্বেচ্ছাচারী সবই ত' তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে! তবে কখনই কি তাঁর করুণার ধারার এক বিন্দুও আমার কাছে পৌঁছাবে না? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পৌঁছাবে তখনই, যখন আমার আত্মসমর্পন শরণাগতি সেই প্রকার উচ্চস্তরে পৌঁছাবে। তখনই আমরা সেই অমূল্য নিধি হাতে পাবো। তবে এটা জানা দরকার যে, কৃষ্ণের ইচ্ছাই সর্বোপরি, তা না হলে শরণাগতির কোন মানেই হয় না।

আমরা শরণাগতির গোড়ার কথাটাকে যদি তলিয়ে দেখি, তবে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে শরণাগতি কোথা থেকে আরম্ভ হয়? সম্পূর্ণ শরণাগতিতে কোন অধিকার বা দাবী বলে কিছু নাই। যেখানে দাবী অধিকারের কথা উঠে, সেখানে শরণাগতি কথাটা নিরর্থক। আমরা এমন কখনও হয়ত মনে করি যে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার পাওয়ার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব। এটা হয়ত জাগতিক ব্যাপারে কিছু চেষ্টা করা যেতে পারে কিন্তু কৃষ্ণের লীলাজগতে ওসব খাটে না।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অন্যের কা কথা ঐশ্বর্য্যাধিষ্টাত্রী স্বয়ং লক্ষীদেবীরও সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। এটা ধারণার অতীত। কৃষ্ণ কোন আইনের অধীন নন, কারো হাতের মুঠোর মধ্যে থাকেন না—সব অধিকারই তাঁর মধ্যেই সংরক্ষিত তাঁর স্বেচ্ছার অধীন। কিন্তু তিনিই সর্বমঙ্গলের আধার, কারুণ্য ঘনবিগ্রহ। এইটিই ত' একমাত্র আশা ভরসা। কৃষ্ণের রাজ্যের সীমানায় আমরা ত' দূরের কথা, স্বয়ং ব্রহ্মারও প্রবেশাধিকার নাই। এমন কি স্বয়ং শিব ও লক্ষ্মীদেবীও সেখানে ঢুকতে পারেন না। কিন্তু আমরা পারি, কেবল শ্রীচৈতন্য নিতাইয়ের প্রেমের পথটি যদি ধরতে পারি। কেবল ঢুকে যাওয়া নয়, সেখানে একটা আসনও জমিয়ে নিতে পারি।

এইটি এত ভালবাসার, এত উচুঁদরের হলেও তাতে দরকার একমাত্র চাওয়ার। যে চৈতন্যের অমূল্য করুণাকণা শিব-বিরিঞ্চিরও কাম্য, সেই করুণাই ত' আমরা চাইব। শিববিরিঞ্চি সেই করুণার একটি কণা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেই কারুণ্যামৃত প্লাবনের স্রোতে ভাসিয়ে দিলেন সকলকে যার এক বিন্দু পাওয়া বদ্ধজীবের সাধ্যের বাহিরে, চিন্তা করারও বাহিরে ছিল। তাই আমরা এক অতৃপ্ত লালসা ও দৃঢ় অচ্ছেদ্য আশাবন্ধ নিয়ে সেই করুণা বরুণালয়ের পাদপদ্মে আর্ত্তিনিবেদন অনবরত করেই জীবনধারণ করতে থাকব। তাঁর দান যে কত মহান্, কত অক্ষয় ভাণ্ডার তা কি আমরা কল্পনা করতে পারি!

শ্রীমদ্ভাগবতের মাত্র দু'টি শ্লোক একটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত, অন্যটি উদ্ধবের কাতর প্রার্থনা—এই দু'টিতেই তিনি আমাদ্গিকে তাঁর করুণার সর্বোচ্চ সীমায় নিয়ে যেতে চেয়েছেন, আমাদের কোন অযোগ্যতাই তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। সেই দুটি শ্লোক নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে—

ন তথা মে প্রিয়তম
আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সংকর্ষণো ন শ্রী-
র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।

হে উদ্ধব! তুমি আমার যত প্রিয়, ব্রহ্মা, শিব, বলদেব, লক্ষ্মী, এমন কি আমার নিজের আত্মাও আমার কাছে তত প্রিয় নয়।

এত গেল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের স্বীকারোক্তি। এখন তার উত্তরে শ্রীউদ্ধব কি চান, তা ও তাঁর স্বাভীষ্ট লালসা এই প্রকার—

আসামহো চরণরেণু যুষামহংস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম-লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

"বৃন্দাবনের গোপীগণ নিজের স্বামী, পুত্র, অন্যান্য স্বজনবান্ধব—যা কি কোন গৃহবধূর পক্ষে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, এত দূরের কথা, তাঁরা নিজের পাতিব্রত্য, তাও কৃষ্ণের পাদপদ্মসেবার জন্য অনায়াসে ত্যাগ করতে একটুও দ্বিধা করেন নাই, আবার কৃষ্ণের সেই পদনখজ্যোতিদর্শন বেদাদি শ্রুতি সমূহেরও কাম্য, হে কৃষ্ণ আমাকে এমন একটি বর দাও যাতে আমি পরজন্মে বৃন্দাবনের তৃণগুল্ম হয়ে জন্মলাভ করি; কারণ, তাতেই আমি সেই ব্রজগোপীগণের পরমপাবন পদধূলিকণা মস্তকে ধারণ করার সৌভাগ্য পাব।"

পরমার্থপথে—প্রেমের পথে যথার্থ অগ্রগতি

পরমার্থের কথা—পরমব্রহ্ম কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির ক্রমপন্থা পদ্মযোনি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা থেকে আরম্ভ করে, দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ উদ্ধবপর্য্যন্ত বিস্তৃত। আবার সেই উদ্ধব কিন্তু আমাদের সোজা বৃন্দাবনে টেনে নিয়ে হাজির করান গোপীদের পাদপদ্মে, যেখানে তিনি নিজেও মাথা ঠেকিয়ে বসে আছেন, আর এইটিইত সর্বোচ্চ পরমার্থপথ। আর যত সব পথ আছে, সবই তখন বাদ পড়ে যায়। আর এ পথটি হল সম্পূর্ণ শরণাগতি—সর্বাত্মনিবেদন ও শুধু কথায় কথায় যেমন তেমন কেবল বাচনিক শরণাগতি নয়। পরিপূর্ণ কায়মনোবাক্যে, অন্যাভিলাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃত অহৈতুকী কেবল কৃষ্ণসুখানু সন্ধানযুক্ত শরণাপত্তি।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ
বৃন্দারণ্যমুদারপানি-রমণাৎতত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুন্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ।

পরব্যোমধাম বৈকুণ্ঠ থেকে কৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা শ্রেষ্ঠ। মথুরা থেকে রাসস্থলী বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। তা থেকে গোবর্দ্ধন গিরিরাজ আরও শ্রেষ্ঠ। কারণ এই গোবর্দ্ধন গিরিগুহায় কৃষ্ণের, রাধারাণী ও গোপীগণের অনেক গোপন প্রেমলীলা সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কিন্তু সর্বাপেক্ষা রাধাকুন্ডই সর্বোপরি। তার উপরে আর শ্রেষ্ঠধাম কিছুই নাই। কারণ এই গোবর্দ্ধন গিরি তটে বিরাজিত রাধাকুন্ডেই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস মাধুর্য্যের চরম পরিপ্রকাশ ঘটেছিল।

এমন কোন রাগাত্মিকা রসিক প্রেমভক্ত আছেন, যিনি রাধাকুন্ডের মহিমা অবগত হওয়ার পর রাধাকুণ্ড ছেড়ে অন্যত্র বাস করতে ইচ্ছুক হবেন? অর্থাৎ একবার যদি কেউ রাধাকুন্ডে রাধা কৃষ্ণের রহঃকেলি দর্শন সেবন সৌভাগ্য পান, তিনি স্বর্গলোক, ত' তুচ্ছ, সত্যলোক এমন কি বৈকুণ্ঠলোকেও বাস করতে চাইবেন না।

কৃষ্ণের অন্তর্হৃদয়

এই সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রেমভক্তি রহস্যে প্রবেশ করার শ্রদ্ধা ও লালসা আমাদের থাকা একান্ত বিশেষ সৌভাগ্য অর্থাৎ সাধু গুরুকৃপা সাপেক্ষ। তা যদি হয় তা হলে আমরা সেই সর্বোচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারি সেই সর্বোচ্চ সর্বোত্তম স্থানই হচ্ছে কৃষ্ণের হৃদয়। কৃষ্ণের হৃদয়কন্দরের একটি নিভৃত কোণে প্রবেশ করে একটু স্থান পাওয়াইত আমাদের সব চেয়ে বড় পাওয়া।

যদিও কৃষ্ণে গোপীগণের কান্তাপ্রেমমাধুর্য্যই সর্বোত্তম, তা কিন্তু একক নয়। দাস্য, সখ্য-বাৎসল্যাদি পরিকর এবং বনপ্রকৃতি ও পরিমণ্ডল সেই কান্তারসোল্লাসের সহায়ক, পরিপুষ্টিকারক। কৃষ্ণের রক্তক-পত্রকাদি দাস, মধুমঙ্গল-সুবলাদি বিশ্রম্ভ সখা ও নন্দ-যশোদাদি পিতামাতার ভূমিকা। তাঁর শ্রীমতীরাধারাণীর সঙ্গে প্রেমকেলিবিলাসের একান্ত পরিপোষক। কান্তা প্রেমরসমাধুর্যই সর্বোত্তম, কিন্তু তা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রেমের একপ্রকার অধীন বলা যেতে পারে। কারণ এঁরা না থাকলে সহায়তা করবে কারা? কৃষ্ণের ও শ্রীমতীরাধারাণীর পরিবার, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিচারক-পরিচারিকা এঁদের রাধাকৃষ্ণপ্রেম লীলা বিলাসে বিভিন্ন উদ্দীপক, সহায়ক ও পরিপুষ্টকরার ভূমিকা রয়েছে। ঐ সমস্ত ভূমিকার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

আর বৃন্দাবনের?? তার ভূমিকা কি কম!! যমুনার পুলিন, বন-তরুলতা, বহুবিধ বিহঙ্গ, ময়ূর, হরিণ-যুগল, গো-সম্পদ, রাখাল বালকগণ, গোবর্দ্ধনের গুহা, মাতৃস্থানীয়া গোপীগণ, সবই যেন যুগল কিশোর-কিশোরীর লীলায় যখন যা আবশ্যক, তার অনুরূপ সব কিছুই সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত এবং যথা কালোপযোগী আনুকূল্য সাধক।

রাধাকৃষ্ণের লীলাবিলাসের জন্য বৃন্দাবনই উপযুক্ত স্থল। রাধারাণী কুরুক্ষেত্রে যখন কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হলেন, তখন তাঁর মন কিন্তু বৃন্দাবনেই চলে যায়। তিনি নিজেত আছেন, কৃষ্ণও তাঁর কাছেই আছে। কিন্তু মনে মনে তিনি বৃন্দাবনের সাহজিক রমনীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য উৎকণ্ঠিতা।

কৃষ্ণের সঙ্গে বৃন্দাবনে যে প্রকার মিলন রসমাধুরী তিনি আস্বাদন করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে থেকেও মনে মনে সেই মিলনসুখ পাওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। বৃন্দাবনে যা কিছু সবই রাধাকৃষ্ণপ্রেমরসলীলায় অপরিহার্য্য, অনুপম, অতুলনীয়। বৃন্দাবনের কোন একটিকে বাদ দেওয়া চলে না।

রাধাকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের বাহিরে নেওয়া চলে না। তেমনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে নবদ্বীপ থেকে বাহিরে নেওয়া অচিন্তনীয়।

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।।

শ্রীরাধাগোবিন্দ ও রাধাগোবিন্দ মিলিত তনু শ্রীগৌরাঙ্গ এই দুই স্বরূপ একটি মুদ্রার দুইটি পার্শ্ব। কোনটিকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

সব কৃষ্ণভক্ত বা গৌরভক্ত প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করার আবশ্যকতা আছেই। কারণ তাতেই উভয় লীলায় সমন্বয় ও সামঞ্জস্য দেখা সম্ভব। এই সামঞ্জস্য দেখার চোখ না থাকলে সবই মৃত, অলীক, কল্পনাবিলাস, কৃত্রিম ও অনাবশ্যক মনে হবে। কিন্তু তা ত নয়ই। কৃষ্ণলীলা একটি Organic Whole একটি সামগ্রিক মৌলিক সনাতন চিন্ময় সত্তা।

শ্রীমতী রাধারাণী বলেন:

"অন্যের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি।
তাহে তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি"।।

আমার মন কেন বৃন্দাবন চায়? আমারত' একমাত্র সুখ 'কৃষ্ণ', কৃষ্ণকে কখনও কি বৃন্দাবনের বাহিরে নেওয়া চলে?

"কৃষ্ণকে বাহির না করিও ব্রজ হৈতে।"

—এই ত' কৃষ্ণ প্রেমিকার মর্মবাণী। বৃন্দাবনের বাহিরে কৃষ্ণকে ত' ভাবতেই পারা যায় না।

তাই কুরুক্ষেত্রে রাধারাণীর কৃষ্ণকে পেয়েও না পাওয়ার বিরহবেদনা আরও তীব্র হতে থাকে। বৃন্দাবনের সেই মুক্ত আকাশের নীচে, লীলার সহায়ক স্বচ্ছন্দ সাবলীল পরিবেশে যে মিলন মাধুর্য্য, তা কুরুক্ষেত্রে কোথায়?

এই প্রকার মর্মভেদী তীব্র বিরহ বেদনা কেবল শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরই এ যুগে বুঝতে বুঝাতে পেরেছিলেন।

এক অপূর্ব বিপ্লবী গুরু

এক সময় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কুরুক্ষেত্রের মহত্ত্ব একটি অনুপম ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছিলেন। আমাদের গুরুমহারাজের শব্দপ্রয়োগ শৈলী এক প্রকার বিপ্লবের সূচনা দিত। আমি তখন প্রায় বছর দু-এক হবে মঠে এসেছি। তখন আমাকে কুরুক্ষেত্র মঠের দায়িত্ব নিতে হল। কুরুক্ষেত্রে থাকাকালে আমাকে কলকাতা গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবের প্রচারকার্য্যের জন্য আসতে হল। তখন গৌড়ীয়মঠ উল্টাডাঙ্গায় একটি ভাড়া ঘরে ছিল। উৎসবের পরে আমার কুরুক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার কথা।

তখন শ্রীল প্রভুপাদ কুরুক্ষেত্রে একটি পারমার্থিক প্রদর্শনী (**Theistic Exhibition**) ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করলেন। সেই প্রদর্শনীতে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দ্বারকার পার্ষদ ও কৃষ্ণমহিষীগণ সহ আগমণ এবং ব্রজগোপীগণের আগমনের বিভিন্ন চিত্রের প্রদর্শনী স্টল্ প্রভৃতি অয়োজনের জন্য আদেশ দিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে যে, একবার সূর্য্যগ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্রে পবিত্রতীর্থ ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করার জন্য দ্বারকাবাসী ও ব্রজবাসীগণ সমবেত হয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ পার্ষদগণের আগমন, অবস্থান এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের যাবতীয় চিত্র ও প্রতিমাদির প্রদর্শনীর বিশহাজার হান্ডবিল ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা যাবে, যাতে হাজার হাজার লোক ঐ প্রদর্শনী দেখতে আসে। এইটাই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ।

ঐ প্রসঙ্গে প্রভুপাদ আমাকে বললেন—"কেবল কতকগুলো বাজে ফাল্তু জড় স্বল্পবুদ্ধির লোকই বৃন্দাবনকে পছন্দ করে।"

শুনেই ত' তাজ্জব বনেগেলাম। এ যাবৎ আমি শুনেছিলাম যে, সাধনার চরম

ধাম হচ্ছে বৃন্দাবন। আরও শুনেছি, যারা নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনতে পারে নাই, তাদের বৃন্দাবনে যাওয়ার কোন অধিকারই নাই। কেবলমাত্র মুক্তপুরুষ গণই বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে পারেন এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন করতে পারেন। বৃন্দাবন কেবল মুক্তপুরুষগণেরই ধাম। যারা ইন্দ্রিয় ভোগবাসনা থেকে নিবৃত্ত হন নাই। তারা বরং নবদ্বীপধামে বাস করে সাধনভজন করতে পারে। কিন্তু বৃন্দাবনে নয়।

কিন্তু এখন প্রভুপাদ বলেন যে, কেবল বাজে লোক, ক্ষুদ্রবুদ্ধির লোকেরাই বৃন্দাবনে বাস করতে চায়। যাঁরা প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমপিয়াসী ভজনানন্দী, তাঁরা বৃন্দাবনের চেয়ে কুরুক্ষেত্রেই বাস করার অধিক পক্ষপাতী।

এসব শুনেই আমি যেন গাছ থেকে পড়ে গেলাম। এ কি? আমি নিশ্চয় গুরুদেবের কথার অন্তর্নিহিত মর্ম বুঝতে পারব।

এর পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আমাদের চিন্তারাজ্যে আর একটি বিপ্লবাত্মক বিচারধারা ঢুকিয়ে দিলেন। তা হল এই—

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ভারতবর্ষের অনেক তীর্থ পরিদর্শন করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে,

"আমি জীবনের শেষপ্রান্তে কুরুক্ষেত্রেই কাটাতে চাই।" আমি ব্রহ্মকুণ্ডে একটি কুটীর নির্মাণ করে সেইখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। কুরুক্ষেত্রই প্রকৃত ভজনস্থলী।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কুরুক্ষেত্র বাসের স্মৃতিতে অভিন্নকুরুক্ষেত্র শ্রীনীলাচল শ্রীক্ষেত্রে সমুদ্রতীরে স্বর্গদ্বারে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিস্থলের পশ্চিমে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিতের ভজনস্থলী সাতাসনমঠের দক্ষিণে স্বর্গদ্বার রোডের উপর একটি দোতালা পাথর গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই ভজন কুটীরের প্রবেশদ্বারে স্বরচিত শ্লোক মার্বেলপাথরে খোদাই করে বসিয়ে ছিলেন। শ্লোকটি এই—

গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ-নামা
কোঽপি স্থিতো ভক্তি কুটীরকোষ্ঠে
স্মৃত্বাহনীশং নাম গুণং মুরারেঃ।।

সেই ভক্তিকুটীর, তার দক্ষিণ প্রবেশদ্বারে স্থাপিত মার্বেলখণ্ড এখনও ইসকন

নির্মিত চারতালা গৃহের প্রবেশদ্বারে সুরক্ষিত রয়েছে। কেন্দ্রাপাড়া, কটক, পুরী, ভদ্রক প্রভৃতি স্থানে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনেক স্মৃতিচিহ্ন এখনও রয়েছে।

বিচক্ষণ চতুর বণিক গোষ্ঠী

যুদ্ধের সময় অনিশ্চিত বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজকোষ জলের মত টাকা ছড়াতে বাধ্য হয়। সেই অবস্থায় টাকার কোন মূল্যই থাকে না। চতুর ব্যবসায়ীরা পণ্য দ্রব্য গোপন করে অভাব দেখিয়ে দর বাড়িয়ে দেয় এবং প্রচুর মুনাফা সংগ্রহ করে নেয়। কেন এসব? প্রয়োজনের তীব্রতার অনুপাতে সেবার মূল্যবৃদ্ধি ঘটে থাকে। চুতুর ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের সময় পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অনুপাতে দরবৃদ্ধির সুযোগ করে নেয়।

এই প্রকার যখন শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণবিরহ যন্ত্রণা চরমে পৌঁছায়, তখন তার সেবার গুরুদায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। সেবার মূল্য বা গুরুত্ব ডিমান্ড বা চাহিদা অনুযায়ী হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কুরুক্ষেত্রে ত' শ্রীরাধারাণীর সেই পরিস্থিতি এসে পড়ে।

কৃষ্ণ শ্রীমতীর এত কাছে; কিন্তু বৃন্দাবন লীলা একেবারে অসম্ভব। ফুটবল খেলার মাঠে যদি দেখা যায় বলটা গোলপোস্টের খুব কাছে এসেই আবার গোলে না ঢুকে ফিরে যায়, তবে সেই দলের কাছে সাংঘাতিক ক্ষতিকারক দাঁড়িয়ে যায়। ঠিক সেইভাবে এত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ এত কাছেই, অথচ তাঁকে এত কাছে পেয়েও কৃষ্ণের খেলার সাথী, পিতা, মাতা, প্রেয়সী গোপীগণ এমন কি শ্রীমতী রাধারাণীও স্বচ্ছন্দ মিলন মাধুর্য্য থেকে বঞ্চিত; কারণ কৃষ্ণ সেখানে রাজাধিরাজ মহামহিম সম্রাট্দ্বারকাধীশ। সে অবস্থায় বৃন্দাবনীয় লীলা-বিলাসের অবসর কোথায়?

তাই এই মর্মভেদী বিচ্ছেদবিধুরা রাধারাণীর দরকার তার একান্ত বিশ্রব্ধ প্রিয় সখী মঞ্জরীগণের নিভৃত সেবা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন, ঐ অবস্থায় এক বিন্দু সেবাও, প্রেমের ভালবাসার সর্বোত্তম সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান সে দিক থেকে নামিয়ে আনতে পারে।

শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলার দু'টি মুখ্য বিভাব আছে তা হচ্ছে সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। এই দুটি রসপ্রস্থানের পারিভাষিক শব্দ। বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা শ্রুতি প্রস্থান নামে খ্যাত। সেই প্রকার রসপ্রস্থানের মুখ্য পরিভাষা সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। এই বিভাগকে আশ্রয় করে যে সব গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে সমস্ত শাস্ত্র রস প্রস্থানের অন্তর্গত।

সম্ভোগ অর্থ মিলন এবং বিপ্রলম্ভ অর্থ বিরহ। যখন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী পরস্পর অতি নিকটেই আছেন, কিন্তু অন্তরঙ্গ লীলার কোন উপায় নাই, তখনই সখী, মঞ্জরী ও তাঁদের সেবাদাসী গণের একটু সেবাও রাধাকৃষ্ণ উভয়ের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। সেই জন্যই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছিলেন, "আমি কুরুক্ষেত্রে ব্রহ্মকুন্ডের তীরে একটি কুটীর করে যুগলসেবার ধ্যানে নিমগ্ন থাকব। যেখানে সেবার অতি উচ্চস্তরের সম্ভাবনা রয়েছে, সেখান থেকে মরজগতে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই।"

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই শ্রীমতী রাধারাণী পরিস্থিতি অনুভব করে প্রিয়সখীকে বললেন,

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিতঃ
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলী পঞ্চম জুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিন বিপিনায় স্পৃহয়তি।।

হে প্রিয়সখী, এখন আমি অনেক দিন পরে আমার প্রাণারামপ্রিয়তম কৃষ্ণের সঙ্গে এই কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছি। আমি পূর্বের সেই রাধাই, আর তিনিও সেই পূর্বের কৃষ্ণই। আজ সেই পূর্বের মত আমরা দু'জন মিলনসুখ পেয়েছি। কিন্তু তথাপি আমি সেই যমুনাতটবর্ত্তী নিকুঞ্জ লতাবিতানে ফিরে যেতে চাই। সেখানে কৃষ্ণের সেই চিত্তচমৎকারী বংশীধ্বনী শুনতে পাব বৃন্দাবনের কদম্বতরুতলে মূরলীর পঞ্চমতান আমার কর্ণকুহরকে পবিত্র করবে।

শ্রীরাধা গোবিন্দ যেখানেই থাকুন না কেন, বৃন্দাবনের আবির্ভাব সেখানেই চাই। বৃন্দাবনের অর্থ কৃষ্ণলীলামাধুর্য্যের পরিপোষক পরিবেশ অর্থাৎ অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডল। এই প্রিয় মণ্ডল না থাকলে লীলা হবে কি করে। রাসরসামৃতলহরীর উদ্‌বেলন হবে কি করে? এই জন্যই বৃন্দাবনের উপযোগিতা একান্ত অনিবার্য্য।

কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই কৃষ্ণ প্রথমে নন্দ যশোদার আবাসে উপস্থিত হলেন। অনেক দিন তিনি নন্দ যশোদার কাছ থেকে দূরে ছিলেন। সুতরাং প্রথমে দেখা দিয়ে তাঁদের বিরহব্যথা কিছুটা দূর করলেন। এতদিন পরে আদরের কাহ্নাকে দেখেই যেন তারা নবজীবন পেলেন। তাঁদের সঙ্গে কিছু ক্ষণ আলাপ করে কৃষ্ণ

তাঁর প্রেয়সী গোপীগণের সাথে পৃথক্ ভাবে দেখা করার ব্যবস্থা করলেন। তারপর তিনি কোন পূর্বসংবাদ না দিয়েই হঠাৎ তাঁদের কাছে উপস্থিত হলেন।

বাহির থেকে দেখতে গেলে কৃষ্ণ তখন ভারতবর্ষের একছত্র সম্রাটরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শত শত নরপতি তাঁর পদতলে নতমস্তক হয়ে প্রণাম নিবেদন করছেন।

অপর পক্ষে ব্রজগোপীগণ বন ও পল্লীপরিবেশের অখ্যাত ভূখণ্ডের আদিবাসীনী অতি সাধারণ গৃহের গোপ রমনীগণ। বলতে গেলে অভিজাত সমাজে তাঁদের কোন স্থানই নাই। আর কৃষ্ণ তিনি ত' সমাজের নেতৃস্থানীয়দেরও নমস্য। গোপীগণ দরিদ্র, অবহেলিত, অসহায় অতিসাধারণ গোপললনা। তাঁরা কৃষ্ণকে দর্শনমাত্রেই আনত স্বরে বললেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্য মগাধবোধৈঃ।
সংসার কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।

গোপীগণ কৃষ্ণকে বললেন, হে পদ্মনাভ! আমরা জানি যে সংসারবিরক্ত যোগীগণ আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে। তাঁরা এই মরজগতের ঊর্দ্ধতর গতি লাভ করার জন্য ব্যাকুল। তারা আপনার পাদপদ্মেই নিরন্তর যোগযুক্ত থাকে। আর যারা জাগতিক ভোগসুখ কামনা করে, তারাও কর্মফল থেকে মুক্তিকামনা করে থাকে। কর্মীও জ্ঞানী ও যোগী এরাও কেবল মুক্তি কামনাই করে থাকে। এই কামনাসক্ত হয়েই তারা আপনার পাদপদ্মের ধ্যান করে। আমরা গোপীগণ ভোগকামনা, কর্মফল স্বরূপ বারবার জন্ম-মরণ জ্বালা থেকে মুক্তি বা জ্ঞানী যোগীদের মত মুক্তি কামী নই।

আমরা অতিসাধারণ গ্রাম্য পরিবেশে বাস করি কেবল গো-সম্পদই আমাদের একমাত্র ধন, আর দুধ বেচাই আমাদের বৃত্তি। সভ্যসমাজের বাহিরে আমরা বাস করি। আমরা ভোগীও নই ত্যাগীও নই। আমরা কেবল আমাদের পরিবার নিয়েই সন্তুষ্ট। আমাদের অন্য কোন যোগ্যতাই নাই। আমরা সমাজের সর্বনিম্নশ্রেণীর পরিবারিক জীবন যাপন করি; তথাপি তৎসত্ত্বে আমরা এসাহসও হৃদয়ে পোষণ করি যে, তুমি যদি কৃপা পরবশ হয়ে তোমার পাদপদ্ম আমাদের হৃদয়ে ধারণ

করার সৌভাগ্য দান কর, তাহলে আমরা নিজেকে ধন্য মনে করব। আমরা সাধন-ভজন জানিনা, ধ্যান-ধারণাও জানিনা, যোগ-জ্ঞান কিছুই জানি না, বেদ-বেদান্ত ত' দূরের কথা। আমাদের কাছে ধর্মশাস্ত্র বা নীতিশাস্ত্রের কোন মূল্যই নাই। কারণ আমরা লেখাপড়া জানি না। আমরা কেবল তোমার রাতুল চরণখানি হৃদয়ে ধারণ করে আমাদের পারিবারিক জীবন ধন্য করতে চাই। তুমি এইটুকুই দয়া কর। তোমার কাছে আমরা আর কিছুই চাই না।

এই প্রকারই গোপীদের প্রার্থনা ছিল। এর উত্তরে কৃষ্ণ বললেন,

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।

দিষ্ট্যা যদাসীন্‌মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।

হ্যাঁ, আমি জানি, মানব শাশ্বতজীবনের জন্যই আমাতে ভক্তি করে। ধর্মের সেতু লংঘন করে নিত্য মুক্ত হয়ে আমার ধামে আসে এবং আমাকে পূজা করে। এই কারনেই তারা আমার সেবা চায়। সৌভাগ্যবশতঃ তোমাদের অন্তরে আমার প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি উৎপন্ন হয়েছে। তার ফলেই তোমরা শেষে আমার সঙ্গ নিত্যকালের জন্য লাভ করবে।

কৃষ্ণ ও গোপীদের মধ্যে যে আলাপ হয়েছিল, স্থূলভাবে তার বিবরণ দেওয়া হল। কিন্তু আমাদের গুরুবর্গ ঐ আলাপের মধ্যে আর একটি অন্তরঙ্গ নির্য্যাস প্রকাশ করে রেখেছেন। আমাদের গুরুবর্গ জানতেন যে, কৃষ্ণ ও ব্রজগোপী এঁদের মধ্যে প্রেমিক ও প্রেমিকার নিত্য, চিরন্তন, কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমসম্পর্ক কখনও ছিন্ন হয় না। তারা উভয় পক্ষ এক নিমিষের জন্যও বিচ্ছিন্ন হন না। কেবল লীলা মাধুর্য্যের গাঢ়তা প্রতিপাদন করে সাধক-সাধারণকে তাতে প্রেরিত করার জন্যই বিরহলীলার প্রকট করে থাকেন। তাই গুরুবর্গ লীলার অন্তর্নিহিত রহস্যঘন গূঢ় অর্থ প্রকট করেছেন। কুরুক্ষেত্রে গোপীদের প্রার্থনা, তার গূঢ় রহস্য এইরূপই—

"ও কৃষ্ণ! আমাদের মনে আছে তুমি আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মথুরা থেকে উদ্ধবকে পাঠিয়েছিলে। তাতে সংসারটা অনিত্য, সব শূন্য, আমরাত' মরবই,তাই এসব প্রেমপ্রীতি মূল্যহীন, আসক্তি কাটাতে হবে— ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রবাণী উদ্ধব তোমার বার্তা বলে আমাদের শুনিয়েছে। তুমি ত' অনেক মহান, তাই তোমাকে সাধনা করে মনে মনে ধ্যান করতে হবে ইত্যাদি। তবে তোমার একটা জানা উচিৎ ছিল যে,

অন্যের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এককরি জানি।
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।।

* * * * * * * * * *

পূর্বে উদ্ধব দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায়।
তুমি— বিদগ্ধ কৃপাময় জানহ আমার হৃদয়
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়।।
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্নকরি, নারি কাঢ়িবারে।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে।।
নহে গোপী যোগেশ্বর পদকমল তোমার
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য-পরিপাটি, তার মধ্যে কুটি-নাটী
শুনি গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ।।
দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাহাঁ তার
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার।

(চৈঃ চঃ মধ্য-১৩)

কৃষ্ণ! কত আশা করে তোমার সঙ্গ পাব বলে বৃন্দাবন থেকে এই কুরুক্ষেত্রে ছুটে এলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে পূণ্য অর্জন করতে আমরা আসি নাই। পূর্বে উদ্ধবকে পাঠিয়ে, এখন নিজেও ঐ একই কথাই বলছ! যোগ-ধ্যানের উপদেশ দিচ্ছ! গোপীরা কবে যোগী হল হে!! যোগীগণ ধ্যান করে একটু সূক্ষ্ম অনুভূতি পেলেই কৃতার্থ। তুমি কেমন করে ধরে নিলে যে আমরাও তাই তোমার চিন্তা করেই বেশ সমাধির আমোদে আফিং খাওয়ার মত বুদ হয়েই থাকব?

আমরা কর্মীদের মত ফলকামী নই। তারা ত' প্রকৃতি থেকে রসদ নিয়ে উপভোগ করে কেবল ঋণই করে চলে। তাই পাপের শাস্তি নরকভোগে ভয় করে তোমার কাছে হাত পেতে দাঁড়ায়—"ওহে আমাদের সব কৃতকর্ম ফলস্বরূপ পাপের শাস্তি থেকে বাঁচাও"। তোমার যদি তাও মনের মধ্যে বাসাবেঁধে থাকে, তবে এটা জেনে রাখ আমরা ঐ দলের নই।

এখন তুমি জিজ্ঞেস করতে পার—তবে তোমরা কোন দলের? এই না?

তবে শোন—আমরা তোমার অন্তঃপুরের পরিবারের নিজজন—তোমার বৈঠক-খানার দূরসম্পর্কীয় বন্ধুও নই, ভদ্র সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিও নই। তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় করার বণিকবুদ্ধি আমাদের নাই।

তোমাকে কিভাবে আমরা পেয়েছি, কতটা পেয়েছি—তোমার সঙ্গে আমাদের শরীরবল, মন বল, আত্মা বল— কোন আকারে কতটা অন্তরের গভীরতম কোণে আমাদের বসতি তা কি তোমার অজানা? তবে কোন্ বিচারে উদ্ধবের দ্বারা আর এখন নিজেই যা বললে, তাতে তোমার একটু লজ্জাও হয়না? এত গেল গোপীদের না বলা কথা।

এখন কৃষ্ণের উত্তরে যা অব্যক্ত, তা ব্যক্তভাষার চেয়ে কত রস-রহস্যঘন, তা শুনা যাক আমাদের গুরুবর্গের ভাষায়।

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তোমরা ত' নিশ্চয়ই জান, প্রত্যেকে আমাকে কত নিবিড়ভাবে চায়। কেবল ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তারা চায়, আমি যেন সর্বোত্তম প্রাপ্তি যা জীবের নিত্যস্বরূপধর্ম, তা লাভ করতে সাহায্য করি, তাই আমার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ প্রেম-সম্পর্কও পেতে পারলে তারা ধন্য হয়ে যায়। কিন্তু অপরপক্ষে আমি ত' মনে করি তোমাদের হৃদয়ে আমি যে একটি প্রেমের আসন পেয়েছি, তা চিন্তা করে আমি নিজেকে অশেষ ভাগ্যবান্ মনে করে ধন্য হয়ে যাই।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের বক্তব্যের রহস্যঘন মর্মার্থ বুঝতে পারল। শ্রীমতী রাধারাণী যখন তা বুঝতে পারলেন তখন তিনি খুবই সন্তোষলাভ করলেন। তিনি এও বিশ্বাস করলেন "কৃষ্ণ যেখানেই স্থূলতঃ থাকুন না কেন, তিনি কেবল আমারই।" তাঁর অন্তরের ব্যথা লাঘব হল, তিনি মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বৃন্দাবনে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন যে, "কৃষ্ণ বৃন্দাবনে শীঘ্র না এসে থাকতে পারবেন না।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী একটি সংস্কৃত রচিত পদাবলীতে কৃষ্ণের উপর কথিত অর্থ আরও সরস ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ যখন গোপীদের ঘরে একাকী এসে মিলিত হলেন, যখন তিনি

হঠাৎ শ্রীমতী রাধারাণীকে সামনে দেখতেই নুয়েঁ পড়ে শ্রীমতীর পদস্পর্শ করতে উদ্যত হতেই রাধারাণী পা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—

"তুমি একি করছ? আমার পা ছুঁতে চাইছ? তুমি ত' কোন অন্যায়ই কর নাই!! তুমি আমার প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবাতু, তুমি আমার প্রাণনাথ। তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর। তুমি স্বেচ্ছাবিহারী, তুমি যা-ইচ্ছা তা করতে পার। তোমার কোন দোষ নাই। আমিত তোমার দাসী, তোমার সন্তোষই আমি চাই।"

কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি কহে মোরে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী অভিমান। (চৈচ : অন্ত :২০)
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ অন্য নয়।
(ঐ অন্ত : ২০)

তোমার সুখের জন্য আমি সব কিছুই করতে প্রস্তুত। তোমারত কোন অপরাধ নাই। বরং আমিই অপরাধী। কেন জিজ্ঞাসা কর? তবে শোন; তোমা থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। এর চেয়ে আর কি দুর্ভাগ্য থাকতে পারে?? তবুও নির্লজ্জের মত আমি মুখ দেখাচ্ছি অপরকে। প্রেমের বাঁধন টুটাবার কারণত আমিই, আমিই অপরাধী, তুমি নও!!

এইভাবেই রাধারাণী কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। ঠিক এইভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলেছেন,—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।।

দূরে শুদ্ধ প্রেমগন্ধ কপটপ্রেমের বন্ধ
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।
তবে যে করি ক্রন্দ ন স্বসৌভাগ্যপ্রখ্যাপন
করি ইহা জানিহ নিশ্চয়।।

আমার মধ্যে কৃষ্ণের প্রেমের একবিন্দুও দেখতে পাই না। তুমি জানতে চাও তবে বুকভাসিয়ে অঝোর নয়নে কাঁদি কেন? দিনরাত তোমার জন্য এই রকম কাটাতে থাকি কেন? তা হলে শোন। এটা কেবল লোক দেখান—লোকবঞ্চনা

মাত্র, লোকে জানুক তোমার জন্য আমার কত প্রেম! আমি তো একটা ছলনাকারিনী! এ কথা কেন বলি? তাও জান না? তার প্রমাণ তোমার চক্ষের সামনেই আমি দাঁড়িয়ে। আমি বেঁচে আছি মরতে পারি নি। যদি একটু প্রেম তোমাতে থাকত, তবে কি তোমার বিচ্ছেদে আমার প্রাণ থাকত?? এটাইত চাক্ষুষ প্রমাণ যে, তোমাতে আমার প্রেমের লেশ মাত্র নাই।"

কৃষ্ণপ্রেম এত উচ্চস্তরের ব্যাপার যে একবার তার স্পর্শ পেলে তা ব্যতীত কোন জীবই বেঁচে থাকতে পারে না। কৃষ্ণপ্রেম এত মহান্ এত সুন্দর, এত উন্মাদক, এত হৃদয় জোড়া!! কেউ কি তা কল্পনা করতে পারে ?? এই স্তরের প্রেম কখনও কি সাধারণ মনুষ্য জীবনে দেখা যেতে পারে?? যদিও অকস্মাৎ কার চিত্তে ঐ প্রেম হয়, তবে তার বিরহে সে এক মুহূর্ত্ত ও জীবন ধারণ করতে পারে না। এ প্রকার প্রেম নৃলো'কে দুর্ল্লভ। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদ্গিাকে সেই প্রেমের আস্বাদন করাতেই এসেছিলেন।

বিষ খাওয়া ছাড়া আর কি গতি আছে?

আমি শুনেছি, দক্ষিণ আমেরিকাতে কিছু লোক যখন দেখল যে, আধুনিক সভ্যতায় সত্যিকারের জীবন ধ্বংস হবেই, তখন তারা সকলে মিলে একসঙ্গে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল। কৃত্রিম চাকচিক্যে ভরপুর অন্তঃসারশূন্য উগ্র আধুনিক মেকি আভিজাত্যভরা তথাকথিত সভ্যতা—যার ভেতরটা অসভ্যতায় পুরোপুরি কলুষিত, এটা তাদের অসহ্য বোধ হল। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল "আমাদের আর বেঁচে থাকা অসম্ভব বরং বিষ ভক্ষণ করে এ প্রকার বেঁচে থাকা থেকে রেহাই পাই। পরলোকে আমরা শাশ্বত শান্তি পাব, এ আশা ও ভরসা আমাদের আছে। জড় জগতে জড় সুখ ভোগবৈভব থেকে মুক্ত হয়ে শান্ত সমাহিত সত্যলোকের পবিত্র পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করব।"

আমাদের বিচারধারা কিন্তু ঐ প্রকার নয়, এ জগতে যে শাশ্বত-শান্তিসুখ নাই—এটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এজগৎ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই। এই মরজগতেও আমরা যে জীবন পেয়েছি, তারই মাধ্যমে আমরা অমৃত লোকের নিত্য শান্তিসুখ অর্জন করতে পারি। এই মানবশরীর অনিত্য হলেও অর্থদ। এই শরীরেও সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেম সম্পদ অনুশীলন করতে পারি।

ঔদার্য্যের সর্বোচ্চ অবধারণার অর্থই বা কি? উদারতার স্বভাবসিদ্ধ সংজ্ঞাটিই বা কি?

যার অভাব সবচেয়ে বেশী, যে বেশী বিপন্ন, দুর্গত, তাকেই আগে সাহায্য করাই বেশী জরুরী—

" যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়"

আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন স্তরের? সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব, দাতৃত্ব যাঁর আসল স্বরূপ। তিনি রাজাধিরাজ। রাজাধিরাজের কাছে যদি কোন ভিখারী হাত পাতে তিনি কি একটা টাকা দিয়ে তাকে বিদায় দিবেন?? তাঁর ঐ টুকু দান সাজে?? যে যত বড়, সে তত বড় দাতা নয় কি? মণি মাণিক্যাদি মহারত্নের অধিকারী কি কাচ বা পাথরকুচি দান করে? সে ত' মণি-মাণিক্যই খোলাহাতে বিলিয়ে দিবে!!

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—মহান ত্রাণকারী প্রেমদাতা

তাই আমরা গৌরহরির রাতুলচরণপ্রান্তে নিজেকে সমর্পন করে ধন্য হব। তাঁর আশ্রিত ভক্তগণ কি বলেন?

যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে?
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে?

শ্রীমদ্ভাগবত ১১/৯/২৯) বলেন,—

লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মনুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীর ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ।
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।

মানবশরীর বহু ভাগ্যের ফলে পাওয়া যায়। তা যদিও অনিত্য তথাপি অনেক জন্মের পরে আমরা এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পেয়েছি। সে সব জন্ম যথা জলচর, বৃক্ষলতা, স্থলচর, পশু, পক্ষী, ভূত, প্রেত ইত্যাদি। কিন্তু এসব জন্মে হরিভজন হয় না। কেবল মনুষ্যজন্মেই তা সম্ভব। এই দুর্লভ অমূল্য জন্ম আমরা যখন বহুভাগ্যফলে পেয়ে গেছি, তখন আর একটুও বিলম্ব না করে ভগবদ্ভজনের জন্য যত্ন করা উচিৎ। কারণ, কে জানে, কোন মুহূর্ত্তে এজীবন শেষ হয়ে যেতে পারে। স্বর্গলোক কেবল ভোগের স্থল। দেবতাদি জন্মে ইন্দ্রিয় ভোগ সুখের প্রাচুর্য্য আছে, ভোগকরার সামর্থ্যও বেশী। এ জন্য ইন্দ্র বরুণাদি দেবজন্মে ভগবদ্ভজনের সম্ভাবনা কম।

এইজন্যই কলিযুগে জন্মলাভ করার জন্য দেবতারাও কামনা করে থাকেন।

এই মানবদেহ সর্বাপেক্ষা বেশী উপযোগী হরিভজনের জন্য। এজন্মে সহজে অল্প সাধনায় সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেয় লাভ করার সুযোগ আছে।

ঔদার্য্যের সর্বোচ্চ প্রকাশ

অনেকেই প্রশ্ন করেন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কেনই বা সর্বোচ্চ স্তরের কৃষ্ণপ্রেম কলিযুগের এই সর্বনিম্নস্তরের মানবগণকে অকাতরে বিলিয়ে দিলেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে কেবল এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এইটিই গৌরাঙ্গ অবতারের স্বাভাবিক কারুণ্য বৈশিষ্ট্য। ব্রজগোপীগণ যাঁরা কৃষ্ণের সর্বোচ্চস্তরের প্রেমিকা, তাঁরা কেন সমাজের সর্বনিম্নস্তরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন? অমোঘদয়ার সিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ একাই নন। তিনি শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর, শ্রীনিবাস এই পরিকর সঙ্গে আমাদের মত পতিতজনের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন। বৃন্দাবনলীলায় কেবল যোগ্য সাধকগণই প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু যত পাপী-তাপী, অধমাধম, দীনহীন এই কলিযুগের জীবকে কৃষ্ণপ্রেমলীলারস বিতরণ করার জন্য কৃষ্ণই নিজে গৌরাঙ্গরূপে রাধা ভাবকান্তি মণ্ডিত হয়ে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর তিনি যে সাধন ভজন পন্থা দিয়েছেন, তা কেবল ঐ পঞ্চতত্ত্বের নাম, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন। তাতেই যাবতীয় পতিত বদ্ধজীব সংসারমুক্ত হয়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলারসমাধুরী আস্বাদন করতে সমর্থ হবে।

শ্রীরাধাগোবিন্দ গোলকে বৃন্দাবনে তাঁদের নিজের নিত্য পার্ষদ এবং সাধনসিদ্ধগণের সঙ্গে লীলা বিহার করেন। আর যুগলমূর্ত্তিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীরাধার ভাবকান্তি সম্বলিত কৃষ্ণই স্বয়ং নিজের অখিলরসামৃত আস্বাদন করেন, লীলা সহচর-সহচরী গণকেও আস্বাদন করান, এইটিই গৌরলীলার রহস্যঘন মাধুর্য্য।

শ্রীগৌর লীলামৃত

বদ্ধজীবের পক্ষে গৌরলীলার মাধ্যমেই কৃষ্ণলীলার সন্ধান ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত। গৌরলীলাই কৃষ্ণলীলার যথার্থপরিচয়, কৃষ্ণলীলার যথার্থ ভাষ্য। গৌরলীলার দ্বারাই কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব, কৃষ্ণলীলারসের মাধুর্য্য ঠিকভাবে আস্বাদন করা যেতে পারবে।

শ্রীগৌরসুন্দরকে আমাদের আত্মার কাছাকাছি পেতে পারলে এমনকি অবচেতন ভাবেও, সেইটি হবে কৃষ্ণলীলা লাভ করার এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি স্বরূপ। পতিত

জীব-আত্মার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন শ্রীগৌর ভক্তির অনুশীলন। ঐটি আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা আনয়ন করবে অনায়াসে। শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তি আমাদের কোন অসংলগ্ন বা ভ্রমাত্মক কৃষ্ণ-ভাবনায় নিয়ে যাবে না— প্রকৃত কৃষ্ণ ভাবনায় আমরা পৌছাব। আমরা পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনা লাভ করব বরং এর চেয়েও বেশী কিছু পাব। সেইটি কি? কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিতরণ।

এ যাবৎ যত যত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচিত হয়েছে তার মধ্যে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এমন একটি শাস্ত্র যার তুলনা পাওয়া অসম্ভব। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একবার উল্লসিত কণ্ঠে ভক্তগণের সম্মুখে প্রকাশ করেছিলেন, পৃথিবীর বক্ষ থেকে সমস্ত ধর্মশাস্ত্র যদি লুপ্ত হয়ে যায়, কেবল শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ থাকে, তবে সব ধর্মশাস্ত্র নির্য্যাস রয়ে গেছে বুঝতে হবে। সেই চৈতন্য চরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণলীলা অমৃতসার তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয় সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাও তাহাতে।।

কৃষ্ণলীলা কি? কি তার স্বরূপ? কৃষ্ণলীলা অমৃতের নির্য্যাস। তা মাধুর্য্যের সার, সুখের সার, আনন্দের সার, মোটের উপর হ্লাদিনী সার সংগ্রহ। কৃষ্ণলীলায় মাধুর্য রসের যে পরিপ্রকাশ ঘটেছে, যা এযাবৎ কল্পনা করাও সম্ভব হয় নাই, তাই কৃষ্ণলীলা। তবে চৈতন্যলীলাটির স্বরূপ কি? চৈতন্যলীলায় কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্যরসামৃত সরোবর শত সহস্র ধারায় দশদিক প্লাবিত করেছে।

তাই কবিরাজ গোস্বামী তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতের উপসংহারে গৌরকৃষ্ণ ভক্তদের আহ্বান জানিয়ে বলছেন, ভক্তগণ! আপনারা সারগ্রাহী হংস। চৈতন্যচরিতামৃত সরোবরে আনন্দে ক্রীড়া করুন। সেই সরোবর থেকে কৃষ্ণলীলা শত সহস্র ধারায় সারা পৃথিবীতে প্লাবন এনেছে। আপনারা বারিবাহী বারিদ খণ্ডের মত সেই সরোবরের অমৃত বয়ে নিয়ে সুকৃতিসম্পন্ন ভক্তদের হৃদয়াকাশকে শীতল করুন। এগিয়ে আসুন। নিজের মানস-হংসকে সেই সরোবর বক্ষে সন্তরণ করে ক্রীড়া করান। আপনাদের মানসহংস সেই চৈতন্যচরিত সরোবরে চিরকাল ক্রীড়া করতে থাকুক আমি এই বিনীত প্রার্থনা আপনাদের কাছে নিবেদন করি।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে

শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ-বিরচিত

অরুণ বসনে সোনার সূরজ
উদিছে কেন রে আজ।
বসন্ত সুষমা উজারি আপনা
ঢালে কেন জগমাঝ।।
তরু গুল্মলতা অপূর্ব্ব বারতা
বহে কেন ফলে ফুলে ।
ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে কেন হেন রঙ্গে
সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে।।
পতিত দুর্জ্জন কেন রে গর্জ্জন
উল্লাসে ফাটিয়ে পড়ে।
বিদ্যা কুল ধন অভিমানী জন
কেন ম্লান দুঃখ ভরে।।
আকাশ বাতাস ঘুচাইয়া ত্রাস
আশ্বাসে ভাসায়ে দেয়।
সাধুজন মন সুখ বিতরণ
আবেশে উন্মাদ হয়।।
চৌদিকেতে ধ্বনি কি অপূর্ব্ব শুনি
বহুজন উচ্চরোল।
হরে কৃষ্ণ রাম নাম দিব্যধাম
হরি হরি হরি বোল।।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা হিন্দোল রঙ্গিমা
সুজন-ভজন রাগে।

সংকীর্ত্তন সনে মরম গহনে
না জানি কিভাব জাগে।।
সন্ধ্যা সমাগম তপন মগন
কেন হেম ঘন কোলে।
অপরূপ কত পূরব পর্ব্বত
সুবর্ণ চন্দ্রমা ভালে।।
সুবর্ণ চন্দ্রমা পশিছে নীলিমা
সে নীল বিলীন হেমে।
ইথে কিবা ভায় সাধুজন গায়
কলঙ্ক না রহে প্রেমে।।
মহাজনে বলে গ্রহণের ছলে
সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্রোদয় পাপ রাহু ক্ষয়
চন্দ্রশোভা প্রেম ধন।।
মর্ম্মজ্ঞ সকলে কহে কুতূহলে
নীলিমা বিলীন চাঁদে।
ছন্ম অবতার লুকান কাহার
রাধা-রুচি-রূপ-ছাঁদে।।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী
মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধামদেব-স্তোত্রম্
অমৃতবিদ্যা (বাংলা, উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী

Centenary Anthology
Golden Staircase
Heart and Halo
Home Comfort
Holy Engagement
Inner Fulfilment
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Sri Sri Prapanna-jivanamritam)
Loving Search for the Lost Servant
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III, & IV)
Sri Guru and His Grace
Srimad Bhagavad-Gita-
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Subjective Evolution of Consciousness
The Golden Volcano of Divine Love
The Search for Sri Krishna Reality the Beautiful

ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
Original Source
The Divine Servitor

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

রচনামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

বাংলা ও ইংরাজী ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায়ও এই বই গুলির অনেকগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া সি ডি, ক্যাসেট ইত্যাদিও প্রকাশিত হয়েছে।

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip Dt. Nadia, Pin 741302. West Bengal, India Ph. (03472) 240086 & 240752 E-mail: math@scsmath.com Web site : http://www.scsmath.com

Affiliated Main Centres & Branches Worldwide

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar pradesh, India
Phone : (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone : (0565)2456778

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India Ph : (06752) 231413

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Klokata, Pin 700055,
West Bengal, India
Phone : (033) 2590 9175 & 2590 6508

Sri Chaitanya Saraswat Math
466 Green Street
London E 13 9DB, U.K.
Phone : (0208) 552-3551

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, U.S.A.
Ph: (831) 462-4712 Fax: (831) 462-9472

St. Ptersburg
Pin 197229 St. Petersburg, P. Lahta
St. Morskaya b. 13, Russia
Phone : (812) 238-2949

Moscow
Str. Avtozavodskaya 6, Apt. 24a
George Aistov Ph : (095) 275-0944

Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia
Phone : (0266) 795541

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brazil
Phone : (012) 263 3168

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Phone : [+58] 212-754 1257

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820, Republic of South Africa
Tel : (011) 852-2781 & 211-0973
Fax : (011) 852-5725

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
1ro. de Mayo No. 1057,(entre Iturbide y Azueta)
Veracruz, Veracrua, c.p. 91700. Mexico Phone : (52-229) 931-3024

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Seva Ashram de Mexico, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
Mexico Phone : (52-33) 3826-9613

Sri Govinda Math Yoga centre
Abdullah Cevdet sokak, No 33/8,
Cankaya 06690 Ankara, Turkey
Phone : 090 312 44115857 & 090 312 4408882

Sri Chaitanya Saraswat Math International
Nabadwip Dham Street, Long Mountain
Republic of Mauritius
Phone & Fax : (230)245-3118/5815/2899

Villa Govinda Ashram
Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC)
Fraz. Regondino Rosso, italy
Tel : [+39] 039 9274445

বদ্ধজীবের পক্ষে গৌরলীলার মাধ্যমেই কৃষ্ণলীলার সন্ধান ও প্রবেশাধিকার নিশ্চিত। গৌরলীলাই কৃষ্ণলীলার যথার্থ পরিচয়, কৃষ্ণলীলার যথার্থ ভাষ্য। গৌরলীলার দ্বারাই কৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃতত্ব, কৃষ্ণলীলারসের মাধুর্য্য ঠিকভাবে আস্বাদন করা যেতে পারবে। শ্রীগৌরসুন্দরকে আমাদের আত্মার কাছাকাছি পেতে পারলে এমনকি অবচেতন ভাবেও, সেইটি হবে কৃষ্ণলীলা লাভ করার এক নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি-স্বরূপ। পতিত জীব-আত্মার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। শ্রীগৌর ভক্তির অনুশীলন। ঐটি আমাদের জীবনের পূর্ণ সার্থকতা আনয়ন করবে অনায়াসে। শ্রীগৌরাঙ্গে ভক্তি আমাদের কোন অসংলগ্ন বা ভ্রমাত্মক কৃষ্ণ-ভাবনায় নিয়ে যাবে না-প্রকৃত কৃষ্ণ ভাবনায় আমরা পৌঁছাব। আমরা পূর্ণ কৃষ্ণ ভাবনা লাভ করব বরং এর চেয়ে বেশী কিছু পাব। সেইটি কি? কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিতরণ।